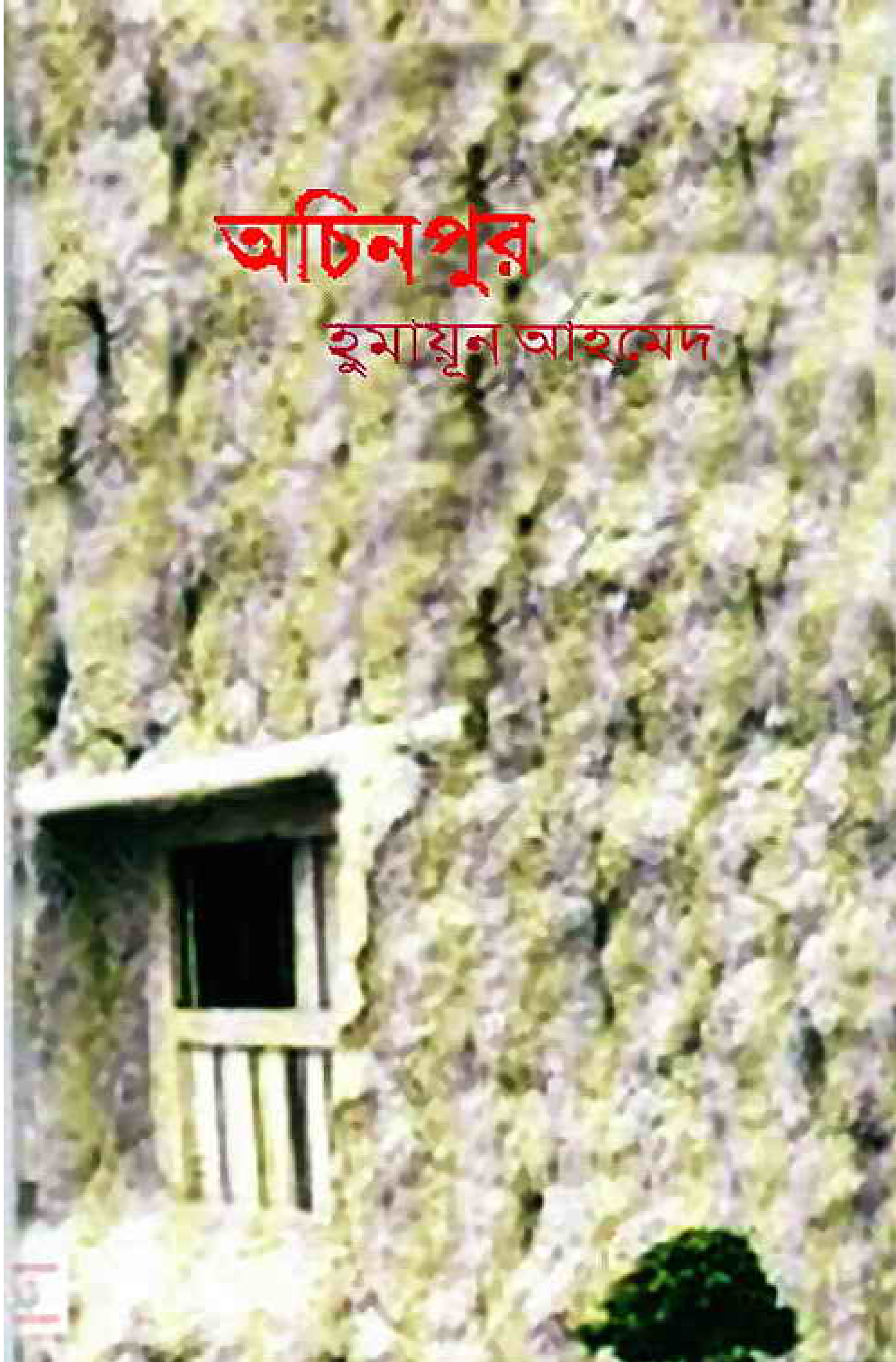

অচিনপুর
হুমায়ূন আহমেদ

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি? সোনাখালি খালের বাঁধান পুলের উপর বসে থাকতে থাকতে এক সময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরান-পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠত। নানিজান বলতেন, 'কানার কাছে এখন কেউ যেও না গো।' শুধু কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, 'পুলাপান কুয়াতলায় কেউ যেও না।' কুয়াতলায় সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারিদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভালো থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প : হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তাঁর চাচা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, ওমনি পেছন থেকে নাকী সুরে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাঁছটা আঁমারে দিঁয়ে যাঁ।'

রাতের বেলা ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়তো ঝুপ করে শব্দ হল বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পেতত্নি নাকি? পেতত্নি নাকি রে?'

নবু মামা প্রায় আমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, 'ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।'

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল, সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটিমাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই না তাকাত আমাদের দিকে। নবু মামা বলত, 'ঐ বুড়ি, আমার দিকে তাকালে কঞ্চি দিয়ে চোখ গেলে দেব।' কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝেমধ্যে বলত, 'পুলাপান ডরাও কেন? আমি কিতা? পেত্নী?' পেত্নী না হয়েও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। শুধু আমরা নই, বড়োরাও তাকে সমীহ করে চলতেন। আর সমীহ করবে নাই-বা কেন? বড়ো নানিজানের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তাঁর বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। এক দিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায়

মরোমরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন যায় তখন যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর। খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মড়ার মাথার কাছে বসে কোরান পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই। আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ', কারণ কানাবিবি সে-সময়ে ভালো মানুষের মতো উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এর পর থেকে স্বভাব-চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হল তার। দিনরাত নামাজ রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজ-কবজ দিচ্ছে। সন্ধ্যা হতে-না--হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনের বেলাও কি নিস্তার আছে? গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পুবের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, ওমনি রহমত মিয়া বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছে, 'খাইয়া ফেলুম। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কচ কচ কচ।' ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা। ব্যাপারটাই ভয়াবহ! বদ্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয় নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মতো ঘিরে রয়েছে আমার চারিদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্প বয়সের ভয়কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবু মামার হাত ধরে ঘুমুতে যাচ্ছে দোতলার ঘরে। নবু মামা বলছেন, 'তুই ভিতরের জানালা দু'টি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে।' আমি বলছি, 'আমার ভয় করছে, আপনিও আসেন।' মামা মুখ ভেংচে বলছেন, 'এতেই ভয় ধরে গেল।' টেবিলে রাখা হ্যারিকেন থেকে আবছা আলো আসছে। আমি আর নবু মামা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নবু মামা শুতে-না-শুতেই ঘুম। একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খটখট করে কে যেন এদিকে আসছে। মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে, আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানতেও পারি নি সে-রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে-রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, 'আর ঘুমিয়ে কি করবি, আয় বেড়াতে যাই।' আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের উপর দু' জনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে-বার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশিরভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সবকিছু। মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'রঞ্জু, আজ তোর খুব

দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কী করতে হয়, জানিস?'

'না।'

'হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্লা বলেন, একে দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।'

'বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।'

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তাঁর হাসিতে চারিদিক গমগম করতে লাগল। আমিও তাঁর সঙ্গে গলা মেলালাম। বাদশা মামা বললেন, 'আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে।' আমি মহা খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কত দিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

২

বাদশা মামার সঙ্গে আমার কখনো অন্তরঙ্গতা হয় নি। অথচ আমরা একই ঘরে থাকতাম। দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণের ঘরে দুটো খাটের একটিতে বাদশা মামা, অন্যটিতে আমি আর নবু মামা। সারা দিন বাদশা মামার দেখা নেই। রাতে কখন যে ফিরতেন, তা কোনো দিনই জানি নি। ঘুম ভাঙার আগে আগেই চলে গেছেন। কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি, গুনগুন করে কী পড়ছেন। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত, সেদিন খুশিখুশি গলায় বলতেন, 'রঞ্জু, শোন তো দেখি, কেমন হচ্ছে বলবি।' আমি হঠাৎ ঘুমভাঙা অবস্থায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। মামা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলা শুরু করেছেন–

'এ রাজ্যপাট যায় যাক,
কোনো ক্ষতি নাই
কিন্তু ত্রিদিব তুমি
কোথা যাবে?'

ভরাট গলা ছিল তাঁর, সমস্ত ঘর কেঁপে কেঁপে উঠত। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলতেন, 'দাঁড়া, পোশাকটা পরে নিই, পোশাক ছাড়া ভালো হয় না। তোল, নবুকে ঘুম থেকে তোল।' নবু মামার ঘুম ভাঙালেই প্রথম কিছুক্ষণ নাকী সুরে কাঁদত। বাদশা মামা বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'গাধা! দেখ না কি করছি।' তারপর দু' জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাদশা মামার দিকে। আলমারি খুলে তিনি মুকুট বের করেছেন, জরিদার পোশাক পরেছেন। তারপর একা একাই অভিনয় করে চলেছেন। আমরা দুই শিশু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

বাদশা মামা প্রথম থেকেই আমাদের কাছে দূরের মানুষ। যিনি জরির পোশাক পরে রাত দুপুরে আমাদের অভিনয় দেখান, তিনি কাছের মানুষ হতে পারেন না। বাড়ির মানুষের কাছেও তিনি দলছাড়া। খুব ছোটবেলায় নানাজান তাঁকে এক বার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে-ছেলে স্কুল পালিয়ে যাত্রাদলে চলে যায়, নানাজানের মতো লোক তাকে ঘরে রাখতে পারেন না। খবর শুনে ছোট নানিজান খাওয়াদাওয়া ছাড়লেন। মরোমরো অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়ে বাদশা মামাকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে তিনি বাদশা মামাকে ঘাঁটান না। বাদশা মামাও আছেন আপন মনে।

বাদশা মামা আমার শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্পীরা সব সময়ই শিশুদের আকর্ষণ করে। হয়তো শিশুরাই প্রতিভার খবর পায় সবার আগে, কিন্তু বাদশা মামা দারুণ অসুখী ছিলেন। যে-সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর ছিল, তা নিয়ে যাত্রাদলের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সমস্ত জগৎ যাত্রাদলকে ঘিরে। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখেছি বারান্দায় চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছেন। যদি গিয়ে বলেছি, 'মামা, কী করেন?'

'কিছু না।'

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়েছে, মামা তেমনি বসেই আছেন। কেউ যদি গিয়ে বলেছে, 'বাদশা তোর কী হয়েছে রে?'

'কিছু না।'

মাঝে মাঝেই এ রকম হ'ত তাঁর। নানাজান তখন ক্ষেপে যেতেন। ছোট নানিজানকে ডেকে বলতেন, 'ভাং ধরেছে নাকি? শক্ত মুগুর দিয়ে পেটালে ঠিক হয়, বুঝেছ?' নানিজান মিনমিন করে কী কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। তারপর একসময় দেখা যায়, তিনি বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন।

নানাজানকে সবাই ভয় করতাম আমরা। দোতলা থেকে একতলায় তিনি নেমে এলে একতলা নীরব হয়ে যেত। খুব কমবয়সী শিশু, যাদের এখনো বিচারবুদ্ধিও হয় নি, তারাও নানাজানকে দেখলে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। ভয়টাও বহুলাংশে সংক্রামক।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙত নানাজানের কোরানপাঠের শব্দে। মোটা গলা, টেনে টেনে একটু অনুনাসিক সুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। তখন মাথায় থাকত লাল রংয়ের ঝুঁটিওয়ালা একটা ফেজ টুপি। খালি গা, পরনে সিল্কের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ঝুঁকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন। ছোট নানিজান এই সময়ে জামবাটিতে বড়ো এক বাটি চা তৈরি করে নিয়ে যেতেন। নানাজান চুকচুক করে অনেকটা সময় নিয়ে চা খেতেন। তারপর নিজের হাতে হাঁসের খোঁয়াড় খুলে দিতেন। পাশেই মুরগির খোঁয়াড়, সেটিতে হাতও দিতেন না। হাঁসগুলি ছাড়া পেয়ে দৌড়ে যেত পুকুরের

দিকে। তিনিও যেতেন পিছু পিছু। সমস্তই রুটিন–বাঁধা, এক চুলও এদিক–ওদিক হবার জো নেই।

কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারো কারো কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দু'টির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে–যাওয়া সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হন নি। অহংকার ছিল খুব, সে–অহংকার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়তো কোনো আত্মীয়–কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে, নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার বলছেন, 'গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড়ো সরমিন্দায় পড়লাম, বড়ো কষ্ট হল আপনার। ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভালো দেখে।' যিনি এসেছেন, আয়োজনের বাহুল্য দেখে তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা চিত্র। স্মৃতি থেকে লিখছি। সে–স্মৃতিকে বিশ্বাস করা চলে।

আমরা যারা ছেলে–ছোকড়ার দলে, তাদের প্রতি নানাজানের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একা একা থাকতেন সারাক্ষণই। বড়ো নানিজান তো কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থই ছিলেন। তিনি দোতলা থেকে নামতেন কালেভদ্রে। ছোট নানিজানও যে কখনো হালকা সুরে নানাজানের সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন দেখি নি কখনো। খালারাও আমাদের মতো দূরে দূরে থাকতেন। ক্ষমতাবান লোকরা সব সময়ই এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যায়।

কেন জানি না, আমার নিজের খুব ইচ্ছে হ'ত, নানাজানের সঙ্গে ভাব করি। ঘুমাতে যাবার আগে কত দিন ভেবেছি, নানাজান যেন এসে আমাকে বলছেন––'আয় রঞ্জু, বেড়াতে যাই।' আমি তাঁর হাত ধরে চলেছি বেড়াতে। কত দিন ভেবেছি, আজ ঘুম থেকে উঠেই নানাজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। ঘুম ভাঙতেই তাড়া পড়েছে, 'ওজু করে পড়তে যা, ওজু করে পড়তে যা।' মৌলভী সাহেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমরা সবাই আমপারা হাতে করে একে একে হাজির হচ্ছি। মেয়েরা ডান পাশে, ছেলেরা বাঁ পাশে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠছে, 'আলিফ দুই পেশ উন, বে দুই পেশ বুন'। নাশতা তৈরি হওয়ামাত্র আরবি পড়া শেষ। তারপর ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্কের পড়া। পড়াতে আসতেন রাম মাষ্টার। ভারি ভালো মাষ্টার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নবু মামা ছাড়া বানিয়েছিলেন––

'রাম মাষ্টার বুড়া
এক পা তার খোঁড়া'

স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। তাঁর কাছে পড়ত শুধু ছেলেরাই। মেয়েদের

আরবি ছাড়া অন্য কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘরের কাজ করত, জরি দিয়ে লতাপাতা ফুল বানাত, বালিশের ওয়াড়ে নকশা তুলে লিখত, 'ভুল না আমায়'। রাম মাষ্টার চলে যেতে যেতে স্কুলের বেলা হয়ে যেত। স্কুল শেষ হয়ে গেলে তো খেলারই পাট। সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলত হৈহৈ। ফুরসত ফেলার সময় নেই। এর মধ্যেই লিলি এসে আমাকে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। সে নিজেকে সব সময় ভাবত আমার এক জন অভিভাবক। সে যে আমার বড়ো বোন এবং নানাজানের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে আমিই যে তার সবচেয়ে নিকটতম জন, তা জানাতে তার ভারি আগ্রহ ছিল।

শাড়ি-পরা হালকা-পাতলা শরীর কোনো ফাঁকে আমার নজরে পড়ে গেলেই মন খারাপ হয়ে যেত। অবধারিতভাবে সে হাত ইশারা করে আমায় ডাকবে। ফিসফিস করে বলবে, 'কাল সবাই দু'খান করে মাছ ভাজা খেয়েছে, আর তুই যে মোটে একটা নিলি?'

'একটাই তো দিয়েছে আমাকে।'

'বোকা কোথাকার! তুই চাইতে পারলি না? আর দুধ দেবার সময় বলতে পারিস না, আরেক হাতা দুধ দাও মোহরের মা।'

'দুধ ভালো লাগে না আমার।'

'ভালো না লাগলে হবে? স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে না? বেকুব কোথাকার!'

এই বলে সে হয়তো কাঁচা-মিঠা গাছের আম এনে দিল আমার জন্য। আবার কোনো দিন হয়তো ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে। আগের মতো গলা নেমে গেছে খাদে। ফিসফিস করে বলছে, 'কী ভাবিস তুই, আমরা কি ফ্যালনা? বড়ো নানিজানের সম্পত্তির অংশ পাব না আমরা? নিশ্চয়ই পাব। বড়ো নানিজানের মেলা সম্পত্তি। আর আমাদের মা হচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে। আমরা দু' জনেই শুধু ওয়ারিসান। বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'কাঁচকলাটা বুঝেছিস। হাঁদার বেহদ্দ তুই। ছি ছি, এতটুকু বুদ্ধিও নেই! নে, এটা রাখ তোর কাছে।'

তাকিয়ে দেখলাম, চকচকে সিকি একটা।

'কই পেয়েছ?'

'আমার ছিল,' বলেই লিলি আবার ফিসফিস করে বলল, 'দেখিস, আবার গাধার মতো সবাইকে বলে বেড়াবি না।'

'না, বলব না।'

লিলির ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, পয়সাটা অন্যভাবে যোগাড় করেছে সে। আমরা দু' ভাই-বোন কখনো হাতে পয়সা পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না। অল্প বয়সে স্নেহটাকে বন্ধন মনে হ'ত। না চাইতেই যা পাওয়া যায় তা তো সব সময়ই

মূল্যহীন।

লিলিকে ভালো লাগত কালেভদ্রে। যেদিন সে খেয়ালের বসে সামান্য সাজ করে, লজ্জা মেশান গলায় আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে যেত, সেদিন তাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম। কিংবা কে জানে অল্প বয়সেই হয়তো করুণা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নাক মুখ অল্প লাল করে বলত-- 'আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তুই থাকবি আমার সঙ্গে।'

'কবে বিয়ে?'

'হবে শিগ্‌গির।'

তারপরই যেন নেহায়েত একটা কথার কথা, এমনিভাবে বলে বসত, 'দেখ তো রঞ্জু, শাড়িতে আমাকে কেমন মানায়।'

'ভালো।'

'কিন্তু আমার নাকটা যে একটু থ্যাবড়া।'

এ বাড়ির কাউকেই লিলি দেখতে পারত না। ভেবে পাই না কেমন করে এত হিংসা পুষে সে বড়ো হয়েছে। আমি ছাড়া আর একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর খাতির ছিল। তিনি আমাদের বড়ো নানিজান। বড়ো নানিজান থাকতেন দোতলায় বাঁদিকের সবচেয়ে শেষের ঘরটায়। অন্ধকার ছোট একটি কুঠুরি। জানালার সামান্য যে ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসে, তাও গাবগাছের ঝাঁকড়া ডালপালা অন্ধকার করে রেখেছে। আলো-বাতাসহীন সেই অল্পপরিসর ঘরে বড়ো নানিজান রাত-দিন বসে আছেন। দেখে মনে হবে নানাজানের দেড় গুণ বেশি বয়স। মাথায় সমস্ত চুল পেকে ধবধব করছে। দাঁত পড়ে গাল বসে গেছে। নিচের মাঢ়ীতে একটিমাত্র নোংরা হলুদ দাঁত। মাঝেমধ্যে তিনি রেলিং ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে নিচে নেমে আসতেন। কী ফূর্তি তখন আমাদের! সবাই ভিড় করেছি তাঁর চারপাশে। নানিজান মস্ত একটি মাটির গামলায় দু' পয়সা দামের হলুদ রঙের হেনরী সাবান গুলে ফেনা তৈরি করেছেন। ফেনা তৈরি হলেই ঢালাও হুকুম--'মুরগি ধইরা আন।' মুরগি ধরে আনবার জন্য ছোটাছুটি পড়ে যেত আমাদের মধ্যে। সব মুরগি নয়। শুধু ধবধবে সাদা মুরগি ধরে আনবার পালা। নানিজান সেগুলিকে সাবান গোলা পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করতেন। পাশেই বালতিতে নীল রং গোলা থাকত। ধোয়া হয়ে গেলেই রং-এ চুবিয়ে ছেড়ে দেয়া। কী তুমুল উত্তেজনা আমাদের মধ্যে!

টগরের সঙ্গে যখন এ গল্প করলাম, সে নিচের ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলল, 'এত মিথ্যে কথাও তোমার আসে? ছিঃ ছিঃ।'

মিথ্যে নয় বলে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড়ো নানিজানকে নিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প আছে। তাঁর ভূতে পাওয়ার গল্পটিও আমি টগরকে শুনিয়েছিলাম।

বড়ো নানিজানের অভ্যেস ছিল সন্ধ্যাবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে নাওয়া। তখন কার্তিক মাস। অল্প অল্প হিম পড়েছে। নানিজান গিয়েছেন অভ্যেস মতো গোসল সারতে। সূর্য ডুবে অন্ধকার হল, তাঁর ফেরবার নাম নেই। মোহরের মা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পুকুরঘাটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে তিনি থরথর করে কাঁপছেন। মোহরের মা ভয় পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে গো?'

নানিজান অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বললেন, 'ও মোহরের মা, টেনে তোল আমাকে, আমি উঠতে পারি না, কত চেষ্টা করলাম উঠতে।'

টগর বলল, 'হিস্টিরিয়া ছিল তোমার নানির। ভূত-ফুত কিছু নয়। তোমার বড়ো নানিজানের ছেলেমেয়ে হয় নি নিশ্চয়ই।'

না, হিস্টিরিয়া ছিল না তাঁর। আর ছেলেমেয়ে যে ছিল না তাও নয়। বড়ো নানিজানের একটিমাত্র মেয়ে ছিল। হাসিনা। সবাই ডাকত হাসনা। তিনি আমার আর লিলির মা।

হাসনা তিন মাসের একটি শিশুকে কোলে করে আর চার বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। কোনো একটি বিশেষ ঘটনার কাল্পনিক চিত্র যদি অসংখ্য বার আঁকা যায়, তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন সেই কাল্পনিক চিত্রকেই বাস্তব বলে ভ্রম হয়। আমি মা'র এ বাড়িতে আসার ঘটনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি ডিটেল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেন আর কুপি মিলিয়ে পনের-বিশটি বাতি জ্বলছে এখানে-ওখানে। বিল থেকে ধরে আনা মাছের গাদার চারপাশে বসে বউ-ঝিরা মাছ কুটছেন আর হাসি-তামাশা করছেন। হাসনা এল ঠিক এ সময়ে। অত্যন্ত জেদী ভঙ্গিতে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখতে পেয়ে সবাই অবাক হয়ে নেমে এল উঠোনে, খড়ম খটখট করে নানাজান নেমে এলেন দোতলা থেকে। আর হাসনা শুকনো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে।

হাসনার বিয়েতে সারা গাঁর দাওয়াত ছিল।

হিন্দুরা মুসলমান-বাড়িতে এখন ইচ্ছে করে মাংস খেতে আসেন, তখন আসতেন না। হিন্দুদের জন্যে ঢালাও মিষ্টির ব্যবস্থা। নাম-করা কারিগর রমেশ ঠাকুর বিয়ের দু' দিন আগে বাড়িতে ভিয়েন বসালেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের জায়গা হয় না ঘরে, নতুন ঘর উঠল এদিকে-ওদিকে। গাঁয়ের দারোগা খেতে এসে আঁৎকে উঠে বলল, 'করেছেন কি খান সাহেব? এ যে রাজরাজড়ার ব্যাপার।' নানাজান হাসিমুখে বললেন, 'প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকে না বললে খারাপ দেখায়, সবাই আত্মীয়-স্বজন।'

গ্রামের নিতান্ত গরিব চাষীও মেয়ের বিয়েতে দু' বিঘা জমি বিক্রি করে ফেলে, হালের গরু বেচে দেয়। আর নানাজান তো তখন টাকার উপর শুয়ে।

হাতি আনতে লোক গেল হালুয়াঘাট। সেখানে কালুশেখের দু'টি মাদী হাতি আছে। বন থেকে কাঠের বোঝা টেনে নামায়। বিয়ের আগের রাতে মাহুতকে ঘাড়ে করে মাতু এসে দাঁড়াল। উৎসাহী ছেলেমেয়েরা কলাগাছের পাহাড় বানিয়ে ফেলল উঠোনে। মাহুতের সঙ্গে দু' দণ্ড কথা বলার জন্যে কী আগ্রহ সবার। 'মাহুত সাহেবের কি একটু তামাক ইচ্ছে করবেন?'

হাতির পিঠে চড়ে বর এসে নামল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে গেট ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা। জরির মালায় বরের মুখ ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কলমা পড়ানর আগে জরির মালা সরান হবে না। সেও রাত একটার আগে নয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বর বন্ধুদের নিয়ে সিগারেট খেতে গেল বাইরে। অমনি হৈহৈ করে উঠল সবাই--'দেখেছি! কী রং! যেন সাহেবদের রং। রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে যেন!'

লিলিরও বিয়ে হল এই বাড়িতে। দশ-পনের জন বন্ধু নিয়ে রোগামতো একটি ছেলে বসে রইল বাইরের ঘরে। নিতান্ত দায়সারা গোছের বিয়ে। ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, এই তো ঢের। তাছাড়া গয়নাটয়নাও তো নেহায়েত কম দেওয়া হয় নি। মায়ের গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুড়ি, নানিজান দিলেন কানের দুল, ছোট নানিজান নাম-লেখা আংটি। কবুল বলতে গিয়ে লিলি তবু কেঁদেকেটে অস্থির। নানাজানের প্রবল ধমকের এক ফাঁকে কখন যে কবুল বলেছে তা শুনতেই পেল না কেউ।

ন' মাইল পাল্কি করে গিয়ে ট্রেন। ট্রেন পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি আর নবু মামা। বেডিংপত্তর নিয়ে দু' জন কামলা আগে আগে চলে গিয়েছে। পাল্কির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না, বারবার পিছিয়ে পড়ি। নবু মামা বললেন, 'পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আমি জুতা খুলে ফেললাম।'

সজনেতলা এসে পাল্কি থামল। বেহারারা জিরোবে। পান-তামুক খাবে। লিলি পাল্কির ফাঁক থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'দুষ্টামি করবি না তো রঞ্জু?'

'না।'

'আমার জন্য কাঁদবি না তো?'

'না, কাঁদব না।'

'কাঁদবি না কিরে গাধা? বোনের জন্য না কাঁদলে কার জন্য কাঁদবি? আমার কি আর কেউ আছে?'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই বাড়ি ঐ বাড়ি করে ট্রেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। নবু মামা কাঁদছেন হু-হু করে। বেহারা এসে বলল, 'দু 'জনে এসে বসেন পাল্কিতে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

লিলিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসে আমার বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল। মনে হল কিছু কিছু চিরন্তন রহস্য যেন বুঝতে পরছি।

৩

আশ্বিন মাস আসতেই সাজ সাজ পড়ে গেল স্কুলে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গান আবৃত্তি তো হবেই, সেইসঙ্গে নাটক হবে স্টেজ বেঁধে। 'হিরণ্য রাজা' নাটকের নাম। হিরণ্য রাজার পার্ট করেছেন বাদশা মামা। উৎসাহের সীমা নেই আমাদের। খালারাও ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন নাটক দেখবার জন্যে। মেয়েদের জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা করা হয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো নাটকফাটক কিছুই দেখে নি। দেখবার শখ খুব। ছোট নানি আর্জি নিয়ে গেলেন নানাজানের কাছে।

'এ সব কি দেখবে? না, না।' বলে প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি তুললেও শেষের দিকে তাঁকে কেমন নরম মনে হল। সুযোগ বুঝে নানিজান বলে চলছেন, 'এক দিনের মোটে ব্যাপার। আমোদ-আহ্লাদ তো কিছু করে না।'

'না--করে না! রাত-দিনই তো আমোদ চলছে। আচ্ছা যাক, পাল্‌কি করে যেন যায়।'

স্কুলঘরে স্টেজ সাজান হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন আসছে কাতারে কাতারে। পর্দায় আড়াল-করা মেয়েদের জায়গায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমি আর নবু মামা বসেছি মেয়েদের সঙ্গে। ছোট নানি আর দু' খালা চাদর গায়ে চুপচাপ বসে আছেন। নাটক শুরু হতে হতে রাত হয়ে গেল। বাদশা মামা সেজেছেন হিরণ্য রাজা! এমন মহান রাজা--দীন-দুঃখীদের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন। দুশ্চরিত্র মন্ত্রী ঘোঁট পাকাচ্ছে তলে তলে। রাজা আপনভোলা মানুষ, কিছু জানতেও পারছেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি সবাই। একসময় হিরণ্য রাজা মনের দুঃখে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রানীও চলেছেন তাঁর পিছু পিছু। নানিজান চমকে বললেন, 'মেয়ে কোত্থেকে এল। কার মেয়ে?'

'ও হচ্ছে হারু দাদা, মেয়ে সেজেছে।'

'ওমা, হারু নাকি!'

নানিজানের চোখে আর পলক পড়ে না। বিবেকের পার্ট করল আজমল। খালারা কাঁদতে কাঁদতে চাদর ভিজিয়ে ফেলল। শেষ দৃশ্যে হিরণ্য রাজা মন্ত্রীকে বলছেন--

এই রাজ্য তুমি লও ভাই। কাজ নাই রাজ্যপাটে
আমি বনবাসে যাব।
সেইখানে শান্তি আপার।

ছোট খালা বললেন, 'বেকুবটা মন্ত্রীকে মেরে ফেলে না কেন?'

মন্ত্রী বলছে, 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক রাজা, বৃথা তর্কে কোনো ফল নাই।' ঝনঝন যুদ্ধ

শুরু হয়ে গেল। নবু মামা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। নানিজান পেছনে থেকে চেঁচাচ্ছেন 'ও নবু বস, দেখতে পাচ্ছি না। বসে পড়।' কী তীব্র উত্তেজনা! রাজার মৃত্যুতে সবার চোখে জল। বাদশা মামার জয়জয়কার। কী পার্টটাই না করলেন!

নানাজানও যে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখবেন, তা কেউ ভাবি নি। পাল্‌কিতে খালারা উঠতে যাবে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। 'বাদশা তো বড়ো ভালো করেছে।' এই বলে পাল্‌কিতে ওঠবার তাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন হেডমাষ্টার সাহেবের বাড়ি। সেখানে তাঁর রাতের দাওয়াত।

বাড়ি গেয়ে দেখি মেহমানে বাড়ি ভর্তি, নান্দিপুর থেকে নানাজানের ফুপাতো বোন এসেছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল সকালই পৌঁছতেন, নৌকার দাঁড় ভেঙে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর নবু মামা অবাক হয়ে গেলাম মেহমানদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে। নানাজানের ফুপাতো বোনের বড়ো মেয়ে। ডাকনাম এলাচি। এমন সুন্দরও মানুষ হয়!

দু' মাসের ভেতর এলাচির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশা মামার। আপাত কার্যকারণ ছাড়াই যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটে তাই কেমন করে পরবর্তী সময়ে মানুষের সমস্ত জীবন বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে।

সে রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার উপর মহা প্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলের মতো একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয়? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মনে। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাজানের বাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল লালবউ, আমি ডাকতাম লাল মামী, নবু মামা ডাকত লাল ভাবী। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মতো গাল। আর কী নামেই-বা ডাকা যায়?

নবু মামা এবং আমি দু' জনে একই সঙ্গে লাল মামীর প্রেমে পড়ে গেলাম। সদা ঘুরঘুর করি, একটু যদি ফুট-ফরমাস করতে দেন এই আশায়। লাল মামী কাকে বেশি খাতির করেন, আমাকে না নবু মামাকে--এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায় দু' জনের। স্কুলে যাবার পথে বই-খাতা নামিয়ে হয় হাতাহাতি।

লাল মামীর বরই খাবার ইচ্ছে হয়েছে, খেলা বন্ধ করে দু' জনেই ছুটেছি ইন্দু সাহার বাড়ি। ইন্দু সাহার বাড়িতে দু'টি বরই গাছ, মিষ্টি যেন গুড়। লাল মামীর ইচ্ছে হয়েছে কামরাঙ্গা খাবেন, ঝাল লঙ্কা মাখিয়ে। বাড়ির পেছনে বিস্তৃত বন। এখানে-ওখানে গাছ আছে লুকিয়ে। দু' জনেই গেছি বনে।

মেয়েরা খুব সহজেই ভালোবাসা বুঝতে পারে। লাল মামী আমাদের দু' জনকেই বুঝে ফেললেন। পোষা বেড়ালের মতো আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই। মোহরের মা বলে, 'পুলা দুইটা মাইয়া স্বভাবের, এসব ভালো না গো।'

আমি আর নবু মামা তখন নির্বাসিত হয়েছি পাশের ঘরে। কতটুকুই-বা দূরে?

লাল মামী হাসছেন, আমরা শুনতে পারছি। লাল মামী বলছেন, 'উঁহু চুল ছিঁড়ে গেল।' আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লাল মামী যদি কখনো বলেছেন, 'এই যা, আজ খাওয়ার পানি আনি নাই', ওমনি নবু মামা তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে, 'ভাবী, পানি নিয়ে আসছি আমি।'

একঘেয়ে কোনো আকর্ষণই আকর্ষণ থাকে না। মায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ ভালোবাসাও ফিকে হয়ে আসে একঘেয়েমির জন্যেই। ভাই-বোনের ভালোবাসার ধরনও বদলাতে থাকে। লাল মামীর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ফিকে হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। তাঁর মতো বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে আমি পরবর্তী জীবনে আর একটিমাত্র দেখেছিলাম।

যে-কথা বলছিলাম--লাল মামী আমাদের বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করলেন। হয়তো আমি আর নবু মামা দু' জনে বসে আছি তাঁর ঘরে। মামী হুকুম করলেন, 'নবু, দরজা বন্ধ করে দে। খোল, এবার আলমারি খোল। রাজার পোশাকটা বের কর তো।'

আমি আঁৎকে উঠে বলেছি, 'বাদশা মামা মেরে ফেলবে।'

ঠোঁট উল্টে মামী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করছেন, 'নে তুই, এই মুকুটটা পরে ফেল। নবু, তুই কি সাজবি, সন্ন্যাসী?'

নবু মামা বললেন, 'তুমি কি সাজবে আগে বল?'

'আমি রানী সাজব।'

'তাহলে আমি রাজা সাজব।'

ততক্ষণে আমি ঢলঢলে মুকুটটা মাথায় পরে ফেলেছি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, 'না, আমি রাজা সাজব।'

মামী বললেন, 'যুদ্ধ হোক দু' জনার মধ্যে। যে জিতবে, সে-ই রাজা।' কথা শেষ না হতেই নবু মামা ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার উপর। দু' জনে ধুলোমাখা মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। যেন এই যুদ্ধে জীবনমরণ নির্ভর করছে। আল্লাহ্ জানেন, নবু মামা এই লিকলিকে শরীরে এত জোর পান কী করে!

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। মুখে নখের রক্তাভ আঁচড়ে, ধূলিধূসরিত শার্ট নিয়ে যখন যুদ্ধজয়ী রাজা দাঁড়ান, তখন মামী নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, আজ আর না, আজ থাক, যা তোরা আমার জন্য তেঁতুল নিয়ে আয়।'

'বল তো তুই, টানলে ছোট হয় কোন জিনিস?'

লাল মামী বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলেন। হাজার চিন্তাতেও মাথায় সে-জিনিসটার নাম আসে না, টানলে যা ছোট হতে থাকে।

'পারলি না? দেশলাই আন, আমি দেখাচ্ছি।'

নবু মামা দৌড়ে দেশলাই নিয়ে আসেন। মামী আমাদের দু' জনের স্তম্ভিত

চোখের সামনে ফস করে একটা বার্ডসাই সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন। কোন ফাঁকে জানি বাদশা মামার কাছ থেকে যোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাদের দু' জনের নিঃশ্বাস পড়ে না। মামী বলেন, 'এই দেখ, যতই টানছি ততই ছোট হচ্ছে।' আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি মামীর দিকে। মামী আধখাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে ধরেন আমাদের দিকে, শান্ত গলায় বলেন, 'নে, এবার তোরা টান। হাঁ করে দেখছিস কি? কষে টান দে। নইলে তো বাড়িতে বলে দিবি।' মামীর মুখের গন্ধ দূর করবার জন্যে পানি আনতে হয়, এলাচ দানা আনতে হয়। সেই সঙ্গে মামীর প্রতি আমাদের এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জড়ো হতে থাকে।

বাড়ির বউ-ঝিরা লাল মামীকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। এ কেমন ধারা বউ? লাজ নেই, সহবত নেই।

কোথায় শাশুড়িকে দেখে এক হাত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়--টগবগিয়ে ঘোড়ার মতো চলে যায়। নতুন বউ রান্নাঘরে গিয়ে বসুক না দু' দণ্ড। ননদের হাত থেকে আনাজ নিয়ে জোর করে কুটে দিক, তা নয়--গলায় বাঁশ দিয়ে হাসছে হিহি হিহি। মোহরের মা সময় বুঝে ছড়া কাটে--

'রূপ আর কয় দিনের?
নিমতা ফুল যয়দিনের!'

নিমতা ফুল সকালবেলাতেই ফোটে, রোদ একটু তেতে উঠতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। কিন্তু যার জন্যে বলা, সে শুনছে কই? শাশুড়ি মুখের উপর কিছু বলেন না। লোকে বলবে, 'বউ-কাটকী শাশুড়ি'। কী লজ্জার কথা!

একমাত্র চাবিকাঠি বাদশা মামা। সে-ই তো পারে বউয়ের রীতিনীতি শুধরে দিতে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়, বউ যাদু করেছে বাদশা মামাকে।

বিয়ের পরপরই বাদশা মামা ভয়ানক বদলে গেছেন। চালচলনে কথাবার্তায় ভয়ানক অস্থিরতা এসেছে। আগে সমস্ত দিন বাইরে পড়ে থাকতেন। রাতের বেলা খেতে আসতেন, বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই যা সংযোগ। এখন সমস্ত দিন বাড়িতে থাকেন। কিন্তু সেও অন্যরকম থাকা। হয়তো মিনিটখানিকের জন্যে লাল মামীর ঘরে এসেছেন, চোখেমুখে ব্যস্ততার ভাব। যেন কোনো দরকারী জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। লাল মামী ভ্রূ কুঁচকে বললেন,

'কী চাও?'

'কিছু না--কিছু না।'

বলে মামা বিব্রত ভঙ্গিতে চলে গেলেন। বসে রইলেন বাইরের ঘরে একা একা। আবার হয়তো এলেন কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বাইরে গিয়ে বসে থাকা। নানিজান এক দিন বললেন, 'বাদশা, কী হয়েছে রে?'

বাদশা মামা কিছু বললেন না। ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবাই অবাক হল, যেদিন বাদশা মামা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে

উধাও হয়ে গেলেন। নানাজান সে দিনই প্রথম লাল মামীর ঘরে এসে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এলাচি, বাদশার কী হয়েছে?'

লাল মামী চুপ করে রইলেন।

নানাজান বললেন, 'তোমাদের মিল হয় না কেন? কী ব্যাপার?'

মামী চুপ করে রইলেন।

নানাজান শান্তগলায় বললেন, 'এলাচি, সরফরাজ খানের বাড়িতে কোনো বেচাল হয় না। খেয়াল থাকে যেন।'

নানাজান বেরিয়ে এসে ছোট নানিজানকে কিছুক্ষণ অকারণে বকে নিচে নেমে গেলেন। সারা দিন বাড়ি থমথম করতে লাগল। সে–সন্ধ্যায় কানাবিবি যখন সাপ খেলান সুরে কোরান পড়তে শুরু করল, তখন--কেন জানি না--ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল।

তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলা বাদশা মামা ফিরে এলেন। ভেতরের বাড়িতে না এসে বাইরের ঘরে বসে রইলেন! নানিজান এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভেতরবাড়িতে। মামা সারাক্ষণই সংকুচিত হয়ে রইলেন। যখন লাল মামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপারটি হল রাতে। বাদশা মামা লাল মামীর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মামী বললেন, 'কে?'

বাদশা মামা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'আমি।'

এদিকে পাশের ঘরে আমি আর নবু মামা কান খাড়া করে বসে আছি। কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। বাদশা মামা নিচু গলায় বললেন, 'দরজাটা খোল।'

লাল মামী কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশা মামা আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমরা তিন জন একখাটে শুয়ে রইলাম। মামা বারবার বলছেন, 'কাউকে বলবি না, খবরদার।'

'না।'

'বললে কান ছিঁড়ে ফেলব দু' জনের, মনে থাকে যেন।'

৪

ভাদ্রমাসের প্রথম দিকে নবু মামা অসুখে পড়লেন, কালান্তক ম্যালেরিয়া। হাত–পা শুকিয়ে কাঠি, পেট পুরে ঢোল। উঠোনে ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করে বেড়ায়, নবু মামা চাদর গায়ে দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে দেখে। ম্যালেরিয়ার তখন খুব ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। গাঢ় হলুদ রং–এর কুইনাইন ট্যাবলেট। সেকালের এক পয়সার মতো বড়ো। আস্ত গেলা যায় না, গলায় আটকে থাকে। সপ্তাহে এক দিন খাবার

নিয়ম, ম্যালেরিয়া হোক আর না–হোক। ওষুধ খেলেই কানে ভোঁ ভোঁ করত, মাথা হাল্কা হয়ে যেত।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে একসময় নবু মামার জ্বর সারল। শরীর খুব দুর্বল। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারা দিন ঘ্যানঘ্যান করে, এটা খাবে ওটা খাবে। খিটখিটে মেজাজ। যদি কোনো কারণে লাল মামী আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, অমনি তার রাগ হয়ে গেছে। 'ওর দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাস।' শুনে লাল মামী নিষ্ঠুরের মতো বলে বসেন, 'তোর দিকে তাকিয়ে হাসব কি রে, তুই তো চামচিকা হয়ে গেছিস?'

নুব মামার আকাশ–ফাটান কান্না থামাবার জন্যে লাল মামীকে অনেকক্ষণ নবু মামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে নবু মামার স্কুল যাওয়াও বন্ধ। রোগা শরীর পেয়ে বিভিন্ন রোগ ইচ্ছেমতো ছেঁকে ধরছে। আজ সর্দি তো কাল জ্বর, পরশু পেট নেমেছে।

কানাবিবির দেওয়া তাবিজের বোঝা গলায় নিয়ে নবু মামা বেচারার মতো ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলা বড়ো জ্বালাতন করে। কিছুক্ষণ পরপর পানি খেতে চায়। পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার পেচ্ছাবের বেগ হয়। পেচ্ছাব করানও কি কম হাঙ্গামা? হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়, নবু মামা হাতে নেন একটা টর্চ। আমাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হয় নানিজানকে। নানিজান আর আমি বসে থাকি বারান্দায়। নবু মামা টর্চ ফেলে ভয়ে ভয়ে যান। তাতেও রক্ষা নেই, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছেন, 'ওটা কি, ঐ যে গেল?'

'কিছু না, শেয়াল।'

'শেয়াল? তবে ছায়া পড়ল না কেন?'

'অন্ধকারে ছায়া পড়বে কি রে হাঁদা?'

নানিজান বিরক্ত হয়ে বলেন।

এই হল নিত্যকার রুটিন।

খাওয়া নিয়েও কি কম হাঙ্গামা? আজ ইচ্ছে হয়েছে কই মাছ ভাজা খাবেন। কই মাছ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ। সবাই অতিষ্ট হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত পীর–ফকির ধরা হল। ধর্মনগরের সুফী সাহেবের পানিপড়া আনবার জন্যে আমি আর বাদশা মামা নৌকা করে ধর্মনগর রওনা হলাম। দু' দিনের পথ। উজান ঠেলে যেতে হয়। সঙ্গে চাল–ডাল নিয়ে নিয়েছি। নৌকাতেই খাওয়াদাওয়া। বাদশা মামা এই দীর্ঘ সময় চুপচাপ কাটালেন। সন্ধ্যার পর নৌকার ছাদে উঠে বসেন। নেমে আসেন অনেক রাতে। সারা দিন শুয়ে শুয়ে ঘুমান। দেখলেই বোঝা যায় ভরসা–হারান মানুষ। কিন্তু কি জন্যে ভরসা হারিয়েছেন, তা বুঝতে না পেরে আমার খারাপ লাগে।

সপ্তম দিনে ফিরলাম। সুফী সাহেব খুব খাতির-যত্ন করলেন আমাদের। তাঁর অনুরোধে বাড়িতে চার দিন থেকে যেতে হল। কথা নেই, বার্তা নেই, বাদশা মামা সুফী সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন। মাথায় সব সময় টুপি, নিয়ম করে নামাজ পড়ছেন। যতই দেখি, ততই অবাক হই।

আমার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল। বাড়িতে ফিরে জানলাম, নবু মামা খুলনা জেলার মনোহরদীপুরে চলে যাচ্ছেন। কিছু দিন সেখানে থাকবেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, শরীর ফিরলে চলে যাবেন রাজশাহী। নানাজানের খালাতো ভাই থাকেন সেখানে। সরকারী জরিপ বিভাগের কানুনগো। নবু মামা সেখানে থেকেই পড়াশোনা করবেন। নানাজান নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে তারই আয়োজন চলছে। নবু মামা আগের চেয়েও মিইয়ে গিয়েছেন। আমাকে ধরা-গলায় বললেন, 'লাল ভাবীকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

আমি ভেবেই পেলাম না একা একা আমি কী করে থাকব। নবু মামা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাকে ছাড়া একা একা স্কুলে যাচ্ছি, এই দৃশ্য কল্পনা করলেও চোখে পানি এসে যায়। নবু মামার আমার জন্যে কোনো মাথা ব্যথা নেই, তার মুখে শুধুই লাল ভাবীর কথা। আমি বললাম, 'নবু মামা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।'

'আমি কী করে নিয়ে যাব? তুই বাবাকে বল।'

নানাজানকে বলবার সাহস আমার নেই। আমি লাল মামীকে ধরলাম। মামী তখন বারান্দায় বসে সুঁচ-সুতো নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে সমস্ত খুলে বললাম। চুপ করে তিনি সমস্ত শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, 'যা তো, দৌড়ে তোর ছোট খালার কাছ থেকে একটা সোনামুখী সুঁচ নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।'

সুঁচ এনে দিয়ে আমার কাতর অনুরোধ জানালাম।

'বলবেন তো মামী? আজই বলতে হবে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই।'

মামী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ঘ্যানঘ্যান করিস, পরের বাড়িতে আছিস যে হুঁস নেই? ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল।'

এর কিছুদিন পরই পানসি নৌকা করে নানাজান আর নবু মামা চলে গেলেন। যাবার সময় নবু মামার সে কী কান্না! কিছুতেই যাবেন না। লাল মামীর শাড়ি চেপে ধরেছে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে-

'আমি যাব না, যাব না।'

লাল মামী শুকনো গলায় বললেন, 'শাড়ি ছাড়, শাড়ি ধরে চেঁচাচ্ছিস কেন?'

৫

নবু মামা চলে যাবার পর আমার কিছু করবার রইল না। আম-কাঁঠালের ছুটি হয়ে

গেছে স্কুলে। সারাদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। বিকেলবেলাটা আর কিছুতেই কাটে না। রোদের তাপ একটু কমতেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সোনাখালি। হেঁটে যেতে যেতে কত আজগুবি চিন্তা মনে আসে। যেন কোনো অপরাধ ছাড়াই দেশের রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়েছে আমার ফাঁসি হবে। রাজ্যের সমস্ত লোক ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে জড়ো হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখি, এদের মধ্যে লাল রঙের পোশাক পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'না, এ ছেলে কোনো দোষ করে নি, এর ফাঁসি হবে না।' বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছে। আমি বলছি, 'না, হোক, আমার ফাঁসি হোক।' মেয়েটি অপলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের গড়ন অনেকটা লাল মামীর মতো।

সোনাখালি পাকাপুলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। সেই সময়ে আমার মন থেকে ভূতের ভয় কেটে গিয়েছিল। একেক দিন নিশীথ রাত্রে একা একা ফিরেছি। অন্ধকারে একা ফিরতে ফিরতে কত বার চমকে উঠেছি নাম–না–জানা পাখির ডাকে। কিন্তু ভয় পাই নি কখনো। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মোহরের মা ভাত বেড়ে দেয়, 'নাও, খেয়ে গুষ্টি উদ্ধার কর।' এই সব কথা কখনো গায়ে মাখি না।

আমি সে–সময় অনেক বড়ো দুঃখে ডুবে ছিলাম। ছোটখাট কষ্টের ব্যাপার, যা প্রতিদিন ঘটত, এই নিয়ে সেই কারণেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

দিন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। স্নেহ, ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। আমি সে–কারণেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাই। কেন জানি না, অসুখটাই ভালো লাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে ঘুমান ছাড়া অন্য কাজ নেই। মাঝেমধ্যে বাদশা মামা এসে বসেন। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা হয়। মামা হয়তো বললেন, 'বেশি করে দুধ খা, শরীরে জোর হবে।'

'আচ্ছা মামা খাব।'

'পীরপুরে জন্মাষ্টমীর মেলা, যাবি নাকি দেখতে?'

'অসুখ সারলে যাব।'

মামা থাকেন অল্পক্ষণ। কথা বলেন ছাড়া–ছাড়া ভঙ্গিতে। দেখে শুনে বড়ো অবাক লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গিয়ে কেমন প্রৌঢ় মানুষের মতো দেখায়।

লাল মামী বড়ো একটা আসেন না। হয়তো দরজার বাইরে থেকে বললেন, 'রঞ্জুর জ্বর আবার এসেছে নাকি?'

'না মামী, জ্বর নেই।'

'না থাকলেই ভালো।' এই বলে তিনি ব্যস্তভাবে চলে যান। তাঁর যাওয়ার পথে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকি। সে–সময়ে লাল মামীকে আমি একই সঙ্গে

ভালোবাসি আর ঘৃণাও করি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ ধরনের দ্বৈত অনুভূতি--সেই আমার প্রথম। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি আরো অনেকের জন্যেই এমন হয়েছে।

ঠিক এ সময়ে আমার সফুরা খালার সঙ্গে অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে, এ আমার খুব ছোটবেলাকার বাসনা। তিনি আমার চেয়ে বৎসরখানেকের বড়ো হবেন। খুব চুপচাপ ধরনের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়। হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে মেঝেতে ঠক করে শব্দ করছেন আর মুখে বলছেন, 'উড়ে গেল পাখি'। প্রথম দিন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি। তিনি আমাকে দেখতে পান নি, কাজেই তিনি লাঠি হাতে ঠকঠক করতে লাগলেন আর পাখি ওড়াতে লাগলেন। আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালা কী করেন?'

লজ্জায় খালার চোখে পানি এসে গেল। কোনো রকমে বললেন, 'কিছু না, আমি খেলি।'

তার পরও খালাকে এমন অদ্ভুত খেলা খেলতে দেখেছি। লজ্জা পাবেন, এই জন্যে আমি তাঁর সামনে পড়ি নি। তাঁর সঙ্গে ভাব করবার আমার খুব ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু তিনি আমাকে দেখলে ভারি লজ্জা পেতেন।

অসুখের সময় প্রায়ই সফুরা খালা এসে দাঁড়াতেন আমার দরজায়। আমি ডাকতাম, 'খালা, ভেতরে আসেন।'

'না, আমি এখানেই থাকি।'

এই বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়। অনেক রকম কথা হ'ত তাঁর সাথে। কী ধরনের কথা, তা আজ আর মনে নেই। মনে আছে, খালা সারাক্ষণই মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

খালা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব গল্প করতেন।

এক দিন এসে বললেন, 'কাল রাতে ভারি আশ্চর্য একটি ব্যাপার হয়েছে রঞ্জু। ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি একটি ফুটফুটে পরী আমার খাটে বসে আছে। আমি তো অবাক। তারপর পরীটি অনেক গল্প করল আমার সঙ্গে। ভোর হয়ে আসছে যখন, তখন সে বলল--আমি যাই। আমি বললাম--ও ভাই পরী, তোমার পাখায় একটু হাত দেব? সে বলল--দাও না। আমি পরীর পাখায় হাত বুলিয়ে দেখলাম, কী তুলতুলে পাখা। আর সেই থেকে আমার হাতে মিষ্টি গন্ধ। দেখ না শুঁকে।'

আমি সফুরা খালার হাত শুঁকতেই বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। খালা হয়তো অনেকক্ষণ বকুল ফুলের মালা হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারই গন্ধ। সফুরা খালা সত্যি ভারি অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

এক রাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি লিলিকে স্বপ্নে দেখলাম। সে

ঠিক আগেকার মতো অভিভাবকসুলভ ভঙ্গি করে বলছে, 'রঞ্জু, তোর একটুও যত্ন হচ্ছে না এখানে। তুই আমার কাছে চলে আয়।'

আমি লিলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কত দিন হয়েছে সে চলে গেছে। এ দীর্ঘদিনেও তার কথা কেন যে মনে পড়ল না! স্বপ্ন ভেঙে গেলে আমার খুব অবাক লাগল। লিলি যে দেখতে কেমন ছিল, তা পর্যন্ত আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তার চিবুকটা লম্বাটে ধরনের ছিল। সেখানে একটা লাল রঙের তিল ছিল। লিলি ছোটবেলায় আমাকে এই তিল দেখিয়ে বলত, 'রঞ্জু, এই তিলটা যদি কপালে থাকত, তাহলে আমি রাজরানী হতাম।'

দীঘদিন পর লিলিকে স্বপ্নে নিখুঁতভাবে দেখলাম। এবং সে-রাতেই ঠিক করলাম ঘুম ভাঙতেই নানাজানের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে লিলিকে আমি চিঠি দেব। এই মনে করে আমার খুব ভালো লাগতে লাগল। মনে হল শরীর সেরে গেছে, একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জোছনা দেখে চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এমন উথালপাথাল আলো দেখলে মানুষের মনে এত দুঃখ আসে কেন কে জানে?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পা যখন ধরে এল, তখন দেয়াল ঘেঁসে বসে রইলাম। হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে লাল মামী কাঁদছেন।

কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মামাও যেন নিচু গলায় কী একটা বললেন। মামী কান্না থামিয়ে ধমকে উঠলেন, 'কোনো কথা শুনব না আমি।'

বাইরের এই অপূর্ব জোছনার সঙ্গে এই ঘটনা কেমন যেন মিশ খায় না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

৬

নানাজান বললেন, 'ঠিকানা নিয়ে কী করবি?'

'চিঠি লিখব।'

'এত দিন পর চিঠি লেখার কথা মনে পড়ল?'

আমি চুপ করে রইলাম। নানাজান একটু কেশে বললেন, 'শরীরের হাল কেমন? জ্বর আছে?'

'জ্বি না।'

'নবু তোর কাছে চিঠিফিটি লেখে?'

'জ্বি, লেখে।'

'পূজার বন্ধে বাড়ি আসবে বলে চিঠি লিখেছে আমার কাছে।' বলতে বলতে নানাজান হঠাৎ কথা থামিয়ে বলেন, 'লিলিরা আগে যেখানে থাকত, এখন সেখানে

নাই। নতুন ঠিকানা তো আমার জানা নাই। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে বলব।'

'লিলি আপনার কাছে চিঠি লেখে নানাজান?'

নানাজান একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কম লেখে।'

আশ্বিনের গোড়াতেই নবু মামা এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। লম্বায় বেড়েছেন, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। ঠোঁটের উপর হালকা নীল গোঁফের রেখা। নবু মামা আমাকে দেখে হৈহৈ করে উঠলেন, 'তোর একি হাল রঞ্জু!'

'অসুখ করেছিল আমার। আপনাকে আর চেনা যায় না মামা।'

'স্বাস্থ্য দেখেছিস? দেখ, হাতের মাস্‌ল্‌ টিপে দেখ।'

মাস্‌ল্‌ টিপে দেখার দরকার পড়ে না। নবু মামার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা হয় আমার। লাল মামী তো নবু মামাকে চিনতেই পারে না, কে এসেছে ভেবে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অমনি নবু মামা খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। মামী বললেন, 'নবু নাকি? তুমি তো বদলে গেছ।'

মামী নবু মামাকে আজ প্রথম তুমি করে বললেন। নবু মামা হেসেই কূল পান না। হাসি থামিয়ে কোনোমতে বললেন, 'ভাবী, তুমি আগের মতোই আছ। না, আগের মতো নয়, আগের চেয়ে সুন্দর।'

অনেক দিন পর নবু মামাকে দেখে কী যে ভালো লাগল! তাছাড়া মামা এত বেশি বদলে গেছেন কী করে, সেও এক বিস্ময়। ছোটবেলায় দু' জনকে তো একই রকম দেখাত। আমি পরম বিস্ময় নিয়ে নবু মামার পিছু পিছু ফিরতে লাগলাম। নবু মামার গল্প আর ফুরোয় না। স্কুলের গল্প, স্কুলের বন্ধুদের গল্প। রাজশাহীর গল্প। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নাটোর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন--তার গল্প। আমি শুনি, আর অবাক হই।

নবু মামা ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও পাশে শুয়ে আছি, কখন নবু মামা জাগবেন সেই আশায়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ছোট নানিজান এসে ডেকে তুললেন। দু' জনে চলে গেলাম লাল মামীর ঘরে। মামীর প্রতি নবু মামার শৈশবের যে-টান ছিল তা দেখলাম এত দিনের অদর্শনে এতটুকুও কমে নি, বরং বেড়েছে।

লাল মামী বললেন, 'নবু, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, পরে গল্প করব তোমার সাথে।' নবু মামা হো হো করে হাসেন, 'না, গল্প এখনি করতে হবে। আর আগের মতো তুই করে ডাকতে হবে।'

এই বলে নবু মামা দরজায় খিল এঁটে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নবু মামা রহস্যময় ভঙ্গিতে তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন, 'তোমার জন্যে কী এনেছি, দেখ ভাবী।'

'কী?'

'বল তো দেখি কী? আন্দাজ কর।'

লাল মামী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। নবু মামা বললেন, 'ছোটবেলায় আমাদের সিগারেট খাইয়েছিলে। আজ আমি সিগারেট নিয়ে এসেছি। আজকে আবার খেতে হবে।'

'তুমি কি এর মধ্যেই সিগারেট ধরেছ নাকি?'

'না, ধরি নি। তোমার জন্যে এনেছি।'

বলেই নবু মামা নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাল মামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

লাল মামী বললেন, 'আমি সিগারেট খাব না।'

'খেতেই হবে।'

নবু মামা জোর করে মামীর মুখে সিগারেট গুঁজে দিলেন। থুথু করে ফেলে দিয়ে মামী শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি বড়ো বেয়াড়া হয়ে গেছ নবু।'

নবু মামা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। এক সময় বললেন, 'ভাবী, তোমার কাছে আমি এত চিঠি লিখলাম, জবাব দাও নি কেন?'

'একটা তো দিয়েছি।'

'না, এবার থেকে সব চিঠির জবাব দিতে হবে।'

এই বলে নবু মামা বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'রঞ্জু, চল মাঠে বেড়াই। খুব বাতাস দিচ্ছে। মাঠে হাঁটলে খিদে হবে।'

মাঠে সে-রাতে প্রচুর জোছনা হয়েছে। চকচক করছে চারিদিক। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে। নবু মামা চেঁচিয়ে বললেন, 'কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় কপকপ করে খেয়ে ফেলি। নবু মামা মুখ হাঁ করে খাবার ভঙ্গি করতে লাগলো। বিস্মিত হয়ে আমি তাঁর আনন্দ দেখলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, বাদশা মামা জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছেন। নবু মামাকে দেখে নির্জীব কণ্ঠে শুধালেন, 'কখন এসেছিস?'

'সকালে। তুমি কোথায় ছিলে?'

বাদশা মামা বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। নবু মামা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

বাদশা মামা এর উত্তরেও বিড়বিড় করলেন।

ভাত খেতে খেতে নবু মামা বললেন, 'বাদশা ভাইয়ের কী হয়েছে?'

নানিজান বললেন, 'যাদু করেছে তাকে?'

'কে যাদু করেছে?'

'কে আবার? বউ।'

নবু মামা রেগে গিয়ে বলল, 'কি সব সময় বাজে কথা বলেন।'

নানিজান বললেন, 'কী যে গুণের বউ, তা কি আর এতদিনে জানতে বাকি আছে আমার? বাদশার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।'

লাল মামী কখন যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, জানতে পারি নি। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কে যাদু করেছে, মা?'

নানিজান বললেন, 'বউ, তুমি চোখ রাঙিয়ে কথা বল কার সঙ্গে?'

'আমি চোখ রাঙিয়েছি?'

'তুমি কার উপর গরম দেখাও বউ, রূপের দেমাগে তো পা মাটিতে পড়ে না। এদিকে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি। বাঁজা মেয়েমানুষ বলে সারা দুনিয়ার লোকে তোমাকে ডাকে।'

নবু মামা বললেন, 'মা, আপনি চুপ করেন।'

'কেন চুপ করব? কাকে ডরাই আমি? বাদশাকে আজ বললে কাল সে তিন তালাক দেয়।'

লাল মামী বললেন, 'তাই বলেন না কেন? ঐ তো বসে আছে চৌকিতে। যান, গিয়ে বলেন।'

নবু মামা আর আমি দোতলায় উঠে দেখি মামী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। আমাদের দেখে উঁচু গলায় বললেন, 'নবু, তুমি কালকে আমাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসবে।'

নবু মামা চুপ করে রইলেন।

নবু মামা এক মাস রইলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিদিন সেগুলি পড়া হ'ত। লোহারামের কেচ্ছা বলে একটি বই ছিল--এমন হাসির! নবু মামা পড়তেন, আমি আর লাল মামী শুনে হেসে গড়াগড়ি। ছোট নানিজান এক-এক দিন রেগে ভূত হতেন।

'আস্তে হাসতে পার না বউ? তোমার শ্বশুর শুনলে কী হবে?'

মোহরের মা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত--

'যত হাসি তত কান্না
কহে গেল রাম সন্না।'

নবু মামা শুনতে পেলে বলতেন, 'মোহরের মা, তোমার রাম সন্নাকে এই বইটা একটু পড়তে দিও। দেখি, ব্যাটা হাসে কি কাঁদে।'

এক দিন হাসির শব্দ শুনে লাজুক পায়ে সফুরা খালা এসে হাজির। দরজার ওপাশে থেকে ফিসফিস করে বলছে, 'ভাবী, তোমরা কী নিয়ে হাসছ?'

'গল্প শুনে হাসছি। হাসির গল্প।'

সফুরা খালা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসি হাসতে লাগলেন। যেন

আমাদের কোনো গোপন অভিসন্ধি টের পেয়ে গিয়েছেন। তারপর আগের মতো ফিসফিসে গলায় বললেন, 'হাসির গল্প আমার ভালো লাগে না।'

তবু তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে নবু মামার গল্প পড়া শুনলেন। তারপর বললেন, 'চল না, সবাই মিলে দীঘির ঘাট থেকে বেড়িয়ে আসি, এখন তো আর লোকজন নেই।'

সেদিন থেকে আমাদের রুটিন হল, গল্পটল্প পড়ার পর দীঘির ঘাটে বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে এক দিন নবু মামার উল্লাসের কোনো সীমা থাকত না। স্কুল থেকে শিখে আসা একটা হিন্দি গান বেসুরো গলায় ধরে বসতেন। প্রথম লাইনটি বোধহয় এ-রকম ছিল-

'মাটি মে পৌরণ
মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা।'

পাখির ডানায় ভর করে সময় কাটতে লাগল। অবশ্যি বেড়াতে এসে মাঝে-মধ্যে লাল মামীর ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সেগুলি ঘটত তখনি, যখন মামী দেখতে পেতেন বাদশা মামা ঘাটের উল্টো দিকে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে হয়, যেন মানুষ নয়, উইয়ের ঢিবি। এতটুকু নড়চড়াও নেই।

দেখতে দেখতে নবু মামার ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল একা একা আমার থাকতে হলে আমি আর বাঁচব না। যতই যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে ততই আমার কষ্ট বাড়তে থাকে। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভারি মন নিয়ে লাল মামীর ঘরে বসে আছি। নবু মামাও কথা বলছে না। এমন সময় নিচে থেকে কানাবিবি ডাকল, 'ও এলাচি বেগম, ও এলাচি বেগম।'

লাল মামী বললেন, 'আসছি। কেমন ডাকে দেখ না।'

নবু মামা বললেন, 'তোমার নাম এলাচি কেন ভাবী?'

'আমার মুখে সব সময় এলাচির গন্ধ থাকে, এই জন্যেই এলাচি নাম।'

নবু মামা এগিয়ে এসেছেন, 'আগে তো কোনো দিন বল নি, শুঁকে দেখতাম। দেখি ভাবী, মাথাটা একটু নিচু কর তো।'

'কী পাগলামী কর নবু!'

বলার আগেই নবু মামা লাল মামীর মাথা জাপটে ধরেছে এবং হৈহৈ করে উঠেছে, 'আরে সত্যি তাই। সত্যি এলাচির গন্ধ।'

ছোট নানিজান ঢুকলেন এ সময়। শুকনো গলায় বললেন, 'ও বউ, তোমাকে এক ঘন্টা ধরে ডাকছে কানাবিবি। কানে শুনতেটুনতে পাও তো?'

লাল মামী বললেন, 'কী জন্যে ডাকছে?'

'সে যে তোমাকে গলায় আর কোমরে বাঁধবার জন্যে তাবিজ দিয়েছিল, সেগুলি কী করেছ?'

'ফেলে দিয়েছি।'

'কেন ফেলে দিয়েছ?'

'তাবিজ দিলে কী হবে?'

নানিজান রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'কী, এত বড় সাহস তোমার বউ? আল্লাহ্‌র কোরান কালামকে অবিশ্বাস! রোজা নাই, নামাজ নাই। বেহায়া বেপর্দা মেয়ে।'

নবু মামা বললেন, 'মা, আপনি চুপ করেন।'

'না, চুপ করব কেন? বউ, শেষ কথা আমার, তাবিজ দিবা কি না কও।'

লাল মামী বললেন, 'আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। সে যদি বলে তাবিজ দিলেই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তাহলে দেব।'

এমন সময় নিচে প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা গেল। আমি আর নবু মামা দৌড়ে গিয়ে দেখি রহমত মিয়া শিকল খুলে কীভাবে যেন বেরিয়ে পড়েছে। হাতের শিকল নাচাচ্ছে, আর বলছে, 'কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কাঁচা খাইয়া ফেলামু।'

লোকজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। দু'-এক জন লম্বা বাঁশ বাগিয়ে ধরে আছে। নানাজান বললেন, 'কেউ ওরে মারবে না, খবরদার। সাবধানে ধর।'

বহু কসরত করতে হল ধরতে গিয়ে। শিকলের বাড়ি খেয়ে হারিস সর্দার তো প্রায় মরোমরো। নানাজান বললেন, 'যাও, নৌকায় করে পাগল হারামজাদাটাকে এক্ষুণি নান্দিপুরের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আস। এঁটো কাঁটা খেয়ে বেশ বেঁচে থাকবে।'

ঘাটে নৌকা তৈরিই ছিল। বহু উৎসাহী সহযাত্রী তৈরি হয়ে পড়ল। একটি জ্বলজ্যান্ত পাগলকে অন্য গ্রামের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসা এ্যাডভেঞ্চারের মতো।

পাগল তো কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। চেঁচামেচি চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু নৌকায় উঠেই তার ভাবান্তর হল। হাত ডুবিয়ে দিল নদীর পানিতে, তারপর খুশিতে হেসে ফেলল।

'আহা, পাগলটার কারবার দেখে বড় মায়া লাগে রে।'

তাকিয়ে দেখি ঘাটের উপর বসে থেকে বাদশা মামা আফসোস করছেন। তাঁর চোখ স্নেহ ও মমতায় চকচক করছে।

পরবর্তী দু' দিন বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত রইল। নবু মামা যে-সকালে চলে যাবেন, সে-সকালে লাল মামীর সঙ্গে কানাবিবির একটা ছোটখাট সংঘর্ষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙেই শুনি লাল মামী বলছেন, 'এ কানাবিবির কাজ। কানাবিবি, তোমার এমন সাহস।'

কানাবিবি বলছে, 'বাড়ির বউ মানুষ কেমন গলায় কথা কয় গো!'

বিষয় আর কিছু নয়। লাল মামী ঘুমুতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর বালিশের নিচে

শাড়ির পাড়ের টুকরো, মাথার চুল, একখণ্ড ছোট হাড়--এই জাতীয় জিনিস সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দেওয়া। বশীকরণের জিনিসপত্র হয়তো। সেই থেকেই এ বিপত্তি।

নবু মামাকে স্টেশনে দিয়ে আসতে আমি সঙ্গে চলেছি। রাত দুটোয় ট্রেন। সন্ধ্যাবেলা খেয়েদেয়ে রওয়ানা হয়েছি। হ্যারিকেন দুলিয়ে একটি কামলা যাচ্ছে আগে আগে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। নবু মামা আর আমি গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ মামা বললেন, 'ও, তোকে বলা হয় নি, লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। শান্তাহার স্টেশনে। প্লাটফরমে বসে ছিল, আমি তাকে চিনতে পারি নি। হঠাৎ ডাকল--নবু মামা না?'

নবু মামা কিছুক্ষণ থেমে বললেন, 'খুব গরিব হয়ে গেছে। রোগা হয়েছে খুব। ময়লা কাপড়চোপড়। এমন খারাপ লাগল দেখে।'

'লিলির বরের সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'না। লিলি বলল, আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে নাকি লুকিয়ে আছে কোথায়।'

'আর কিছু বলে নি?'

'তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তার অবস্থা একটু ভালো হলেই তোকে নাকি তার কাছে নিয়ে যাবে।'

নবু মামা বললেন, 'তোর মন খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমারো হয়েছে। বিয়ের পর যখন লিলির শ্বশুরবাড়ি গেল, মনে আছে রঞ্জু?'

'আছে।'

'ট্রেনে উঠে কী কাঁদাটাই না কাঁদল।'

নবু মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

৭

সেবার আমি খুব অর্থকষ্টে পড়লাম।

স্কুলের বেতন দিতে হয়। মাঝেমধ্যে চাঁদা দিতে হয়। আগে নবু মামা যখন দিতেন, সেই সঙ্গে আমারটাও দিয়ে দিতেন। এখন আমি একলা পড়েছি। নিজ থেকে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না। পোশাকের বেলায়ও তাই। নবু মামার কাপড়-জামা বরাবর পরে এসেছি। লিলিও প্রায়ই বানিয়ে দিয়েছে। অসুবিধে হয় নি কিছু। এখন অসুবিধে হতে লাগল। কী করব ভেবে পাই না। বাদশা মামার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করে। আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবা খুব কষ্ট ও লজ্জার ব্যাপার। আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল লিলির

কাছে চলে যাই। কিন্তু তার কাছে চিঠি লিখে জবাব পাই না। পুরনো জায়গা ছেড়ে তারা নতুন যেখানে গিয়েছে, তার ঠিকানাও জানায় নি কাউকে।

তাছাড়া নানাজানের সংসারেও নানা রকম অশান্তি শুরু হয়েছে। তাঁর জন্মশত্রু হালিম শেখ জমি নিয়ে মামলা শুরু করেছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো। বৃদ্ধ বয়সে নানাজানকে কোর্ট–কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাদশা মামাকে দিয়ে তো কোনো কাজ করাবার উপায় নেই। তিনি জড় পদার্থের মতো হয়ে গিয়েছেন। সুফী সাহেবের বাড়ি থেকে ফেরবার পর বেশ কিছুদিন ধর্ম–কর্ম নিয়ে ছিলেন। লোকে ভালোই বলেছে। এখন সে–সব ছেড়েছেন। নেশা–ভাংও নাকি করেন আজকাল।

সফুরা খালাকে নিয়েও অনেক রকম অশান্তি হচ্ছে। কখন তিনি দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। এক বার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ছেলের বাবা মেয়ে দেখে মহা খুশি। এমন ভালো স্বভাবের মেয়ে সে নাকি তার সমস্ত জীবনে দেখে নি। কিন্তু বিয়ে হল না। সফুরা খালাকে নিয়ে তখন নানা রকম রটনা। তার নাকি মাথা খারাপ। রাতেবিরেতে মেয়ে নাকি পুকুরঘাটে একা একা হেঁটে বেড়ায়। এক বার কোনো মেয়ে সম্পর্কে এ জাতীয় কথা ছড়িয়ে পড়াটা খুব খারাপ লক্ষণ। এ নিয়ে ঘরেও অশান্তির শেষ নেই। নানিজান বিনিয়ে বিনিয়ে গানের মতো সুরে কাঁদেন। মাঝে মাঝে আপন মনে বলেন, 'আমার নসীব। বিয়ে করালাম ছেলে, বউটা বাঁজা-–মেয়েটাও আধপাগল।'

কিন্তু যাকে নিয়ে এত অশান্তি, সেই সফুরা খালা নির্বিকার। আমি এক দিন সফুরা খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালা, আপনি নাকি রাতবিরেতে একা একা ঘুরে বেড়ান?'

খালা মৃদু গলায় বলেন, 'একা একা পুকুরঘাটে বসে থাকতে এত ভালো লাগে!'

তাঁকে নিয়ে চারিদিকে যে এত অশান্তি, সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আছেন আপন মনে। তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে শুরু করল। খালাকে আমি তখন ভালোবেসে ফেলেছি।

আসলে খালাকে আমি একটুও বুঝে উঠতে পারি নি। যাবতীয় দুর্বোধ্য বস্তুর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেই জন্যেই তাঁর প্রতি আমার প্রবল ভালোবাসা গড়ে উঠল। আমার ইচ্ছে হল তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক। কিন্তু তিনি নিজের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। এই দেয়াল ভেদ করে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় নেই। নিজের সৃষ্ট জগতেই তিনি ডুবে আছেন। বাইরের প্রতি একটুও খেয়াল নেই। ইচ্ছে হল তো চলে গেলেন পুকুরপাড়ে, একা বেড়াতে গেলেন বাগানে।

এ–সব দেখেশুনে কেন জানি না আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সফুরা খালা

বড়ো রকমের দুঃখ পাবে জীবনে। এ-রকম মনে করবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হ'ত, একেই হয়তো intuition বলে।

পরবর্তী জীবনে দেখেছি আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দুঃখ এসেছে এবং অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মতো দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এই মেয়ের গল্প আমি অন্য কোথাও বলব, আজ শুধু হাসান আলির কথাটাই বলি।

হাসান আলি বাজারে কিসের যেন ঠিকাদারী করত। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়স। ভীষণ গরিব। নানাজানদের কী রকম যেন আত্মীয়। থাকত নানাজানদের বাংলাঘরে। (বাড়ির বহির্মহলে অতিথিঅভ্যাগতের জন্যে নির্মিত ঘরকেই বাংলাঘর বলা হত)।

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের ছেলে। যতক্ষণ ঘরে থাকত, ততক্ষণ বসে বসে হিসাবপত্র করত। আমরা সে-সময় তার ঘরে হাজির হলে বিনা কারণে আঁৎকে উঠত। তার পরই সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ-মুখ লাল করে এক বিশ্রী কাণ্ড! প্রতি হাটবার দিন দেখতাম, সে অল্প কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। মিষ্টি আনা হয়েছে নানাজানের বাড়ির মানুষদের জন্যেই, কিন্তু দেওয়ার সাহস নেই। অনেক রাতে কাউকে ডেকে হয়তো ফিসফিস করে বলল, 'একটু মিষ্টি এনেছিলাম।' বাড়ির প্রায় মানুষই তখন ঘুমে।

সফুরা খালা এক দিন বললেন, 'ও রঞ্জু, হাসান আলি বলে একটা লোক নাকি থাকে বাইরের ঘরে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?'

'ও আল্লা, মজার ব্যাপার হয়েছে। পরশুদিন দীঘির পাড়ে একা একা গিয়েছি, দেখি কে-একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, 'কে ওখানে? লোকটা বলল--আমার নাম হাসান আলি, আমি আপনাদের বাংলাঘরে থাকি। আমি তখন ভাবলাম ফিরে যাই। লোকটা বলল--এত রাতে আপনি একা একা আসেন কেন? কত সাপ-খোপ আছে। আমি বললাম--আপনি তো আসছেন, আপনার সাপের ভয় নাই? লোকটা তখন কী বলল জান রঞ্জু?'

'না।'

'বলল, আপনি বড়ো ভালো মেয়ে। এই বলেই হনহন করে চলে গেলে। কী কাণ্ড দেখেছ?'

এর কিছুদিন পরই শুনলাম হাসান আলি নানাজানের কাছে তাঁর ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছে। নানাজান তো রেগেই আগুন। বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সফুরা খালা শুধু বলেন, 'আহা, বেচারা গরিব বলে কি সবাই এ-রকম করবে! ছিঃ!' লাল মামী ও কথা শুনে বললেন, 'আমাদের সফুরার ভাতারকে নিয়ে কেউ তামাশা করবে না। খবরদার, সফুরা মনে কষ্ট পায়।' নানিজান

লাল মামীর কথা শুনে রেগে যান, চেঁচিয়ে বলেন, 'একি কথা বলার ঢং বউ!'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না, নানাজান হাসান আলিকে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে বললেন। শরৎকালের এক সকালে নৌকা করে হাসান আলি চলে গেল। দু'টি ট্রাঙ্কের উপর বিবর্ণ সতরঞ্চিতে ঢাকা একটি বিছানা--তার পাশে মুখ নিচু করে বসা হাসান আলি।

সফুরা খালা এর পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। মুখে শুধু এক বুলি, 'বিনা দোষে কষ্ট পেল লোকটা।' নবু মামা অনেক পরে এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন, 'আমি থাকলে দিতাম শালার ঘাড়ে গদাম করে এক ঘুষি।' সফুরা খালা বিষণ্ন কণ্ঠে বলেছেন, 'ছিঃ নবু ছিঃ।'

৮

অচিনপুরের গল্প লিখতে লিখতে গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অনুভব করছি সুখ এবং দুঃখ আসলে একই জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বদলে গিয়ে দুঃখ হয়ে যায়। দুঃখ হয় সুখ। জীবনের প্রবল দুঃখ ও বেদনার ঘটনাগুলি মনে পড়লে আজ আমার ভালো লাগে। প্রাচীন সুখের স্মৃতিতে বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

হাসনার কোলে তিন মাস বয়সের যে-শিশুটি এ সংসারে প্রবেশ করেছিল, তার ভূমিকা তো যুক্তিসঙ্গত কারণেই তৃতীয় পুরুষের ভূমিকা হবে। তার উপস্থিতি হবে ছায়ার মতো। সরফরাজ খানের এই পরিবারটির সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি তাদের জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবেই না জড়িয়ে পড়লাম। বাদশা মামার মলিন চেহারা দেখলে আমার মন কাঁদে। সফুরা খালা যখন হেসে হেসে বলেন, 'রঞ্জু, আমার খুব ইচ্ছে এক দিন অনেক রাত্রে পুকুরে একা একা সাঁতার কেটে গোসল করি। পুকুরঘাটে তুমি আমার জন্যে একটুখানি দাঁড়াবে রঞ্জু? কেউ যেন জানতে না পারে।' তখন সফুরা খালার জন্যে আমার গাঢ় মমতা বোধ হয়। অথচ আমি নিশ্চিত জানি এক দিন লিলির চিঠি আসবে। আমি এদের সবাইকে পিছনে ফেলে চলে যাব।

হালিম শেখের সঙ্গে পরপর দু'টি মামলাতে নানাজানের হার হল। এত দিন যে-জমিতে নানাজানের দখলিসত্ত্ব ছিল, হালিম শেখের লোকজন লাল নিশান উড়িয়ে ঢোল আর কাঁসর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সে-জমির দখল নিল। গ্রামের লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়াল হালিম শেখ।

জমির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। অর্থব্যয়ও হয়েছে সামান্য। নানাজানের মতো

লোকের কাছে সে-টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন। রোজকার মতো উঠোনে বসে কোরান-পাঠ করতে বসেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। খাওয়া কমে গেল। রাতে ঘুমুতে পারেন না। উঠোনে অনেক রাত পর্যন্ত চেয়ার পেতে বসে থাকেন। নানিজান মাথায় হাওয়া করেন, পায়ে তেল মালিশ করে দেন।

দিন সাতেক পর নানাজান ঘোষণা করলেন, তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করতে চান। নবু মামার কাছে চিঠি গেল, তিনি যেন পত্রপাঠ চলে আসেন, পড়াশোনার আর প্রয়োজন নেই। লোক পাঠিয়ে দামী কাফনের কাপড় কেনালেন। কবরের জন্য জায়গা ঠিক করা হল। কবর পাকা করবার জন্য ইট আনান হল। মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। বাড়ির সবাই এই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় বড়ো নানিজান মারা গেলেন।

মোহরের মা রোজ সকালে দুধ নিয়ে যায় নানিজানের ঘরে। সেদিন কী কারণে যেন দেরি হয়েছে। দুপুরের দিকে বাটিভর্তি দুধ নিয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকেই বিকট চিৎকার। মৃত্যু এসেছে নিঃশব্দে। কেউ জানতেও পারে নি, কখন কীভাবে মারা গেলেন।

আমরা সবাই তাঁর ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। পরিপাটি বিছানা পাতা। বালিশের চাদর পর্যন্ত একটুও কোঁচকায় নি। বড়ো নানিজান সেই পরিপাটি বিছানায় শক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইঁদুর কিংবা অন্য কোনো কিছু তাঁর ঠোঁট আর একটি চোখ খেয়ে গিয়েছে। বিকট হাঁ করা সেই মূর্তি দেখে সফুরা খালা 'ও মাগো' 'ও মাগো' বলে কাঁদতে লাগলেন। লাল মামী সফুরা খালার হাত ধরে তাঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নানাজানের জন্যে কেনা কাফনের কাপড়ে তাঁর কাফন হল। নানাজানের জন্যে ঠিক করে রাখা জায়গায় কবর হল তাঁর। যে-ইট নানাজান নিজের জন্যে আনিয়েছিলেন, সেই ইট দিয়ে কবর বাঁধিয়ে দেওয়া হল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা সবাই বড়ো নানিজানের কথা ভুলে গেলাম। আগের মতো ঝগড়া, রং-তামাশা চলতে লাগল। বড়ো নানিজানের ঘর থেকে তাঁর সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলে সংসারের প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ-রসুন রাখা হল গাদা করে।

দিন কেটে যেতে লাগল। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। সেই একা একা হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালি চলে যাওয়া। পুকুরঘাটে রাতের বেলা চুপচাপ বসে থাকা। এর বাইরে যেন আমার জানা কোনো জগৎ নেই। সমস্ত বাসনা-কামনা এইটুকুতেই কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যে এক দিন নানাজান আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'তোমার বড়ো নানিজান তাঁর নিজের সম্পত্তি তোমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন দানপত্র করে।'

বড়ো নানিজান তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন জানতাম। তার পরিমাণ যে কত তা কেউই জানত না। নানাজান বললেন, 'অনেক জায়গা-জমি, লিলির আসা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানাই তো জানা নেই।'

৯

রাজশাহী থেকে খবর এল, স্কুল ফাইনাল দিয়েই নবু মামা কাউকে কিছু না বলে কোলকাতা চলে গেছেন। নানাজানের মুখ গম্ভীর হল। নানিজানের কেন জানি ধারণা, নবু মামা আর কখনো ফিরবে না। তিনি গানের মতো সুরে যখন কাঁদতে থাকেন, তখন বলেন, 'এক মেয়ে পাগল, এক ছেলে বিবাগী, এক বউ বাঁজা'।

শুনলে হাসি পায়, আবার দুঃখ লাগে। বাদশা মামা মাঝেমধ্যে গিয়ে নানিজানকে ধমক দেন, 'কি মা, আপনি সব সময় বাঁজা বউ বাঁজা বউ করেন?'

নানিজান ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'ও বাঁজা বউরে আমি আর কী বলে ডাকব?'

'আহা, এলাচি মনে কষ্ট পায়।'

নানিজান কপালে করাঘাত করেন আর বলেন, 'হা রে বউ, তুই কি যাদুটাই না করলি!'

বাদশা মামা চিন্তিত, বিরক্ত আর ক্লান্তমুখে চলে আসেন।

নবু মামা হঠাৎ করে কোলকাতা চলে যাওয়ায় খুশি মনে হয় শুধু সফুরা খালাকে। আমাকে ডেকে বলেন, 'আমি ছেলে হলে নবুর মতো কাউকে না বলে আমিও চলে যেতাম।'

আট-দশ দিন পর নবু মামা কোলকাতা থেকে টাকা চেয়ে পাঠাল। নানাজান লোক মারফত টাকা পাঠালেন। নির্দেশ রইল, ঘাড় ধরে যেন তাকে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেয়া হল নবু মামাকে বিয়ে দেওয়া হবে। নানাজান মেয়ে দেখতে লাগলেন। নানিজান মহা খুশি। লাল মামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, 'নতুন বউয়ের এক বৎসরের ভেতর ছেলে হবে, আমি স্বপ্ন দেখেছি।'

টাকা নিয়ে লোক যাওয়ার কয়েক দিন পরই নবু মামা এসে পড়লেন। সরাসরি এসে বাড়িতে তিনি উঠলেন না, লোক মারফত খবর পাঠালেন কাউকে কিছু না বলে আমি যেন আজিজ খাঁর বাড়িতে চলে আসি।

আজিজ খাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে নবু মামা গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। মাথায় বেড়েছেন কিছু। গায়ের রং ফর্সা হয়েছে। আমাকে দেখে রহস্যময় হাসি হাসলেন, 'বাড়িতে কেউ জানে না তো আমি এসেছি যে?'

'না।'

'গুড।'

'কী ব্যাপার নবু মামা?'

'একটা প্ল্যান করেছি রঞ্জু। লাল ভাবীকে একেবারে চমকে দেব। গ্রামোফোন কিনেছি একটা। ঐ দেখ টেবিলে।'

আমি হাঁ করে টেবিলে রেখে দেওয়া বিচিত্র যন্ত্রটি তাকিয়ে দেখি। নবু মামা হাসিমুখে বলেন, 'পাঁচটা রেকর্ডও আছে। এক শ' পনের টাকা দাম।'

নবু মামার প্ল্যান শুনে আমার উৎসাহের সীমা থাকে না। রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নবু মামা গ্রামোফোন নিয়ে চুপি চুপি যাবেন। যে-ঘরটায় আমি আর নবু মামা থাকি সেই ঘরটায় চুপি চুপি এসে গ্রামোফোন বাজানর ব্যবস্থা করা হবে। গান শুনে হকচকিয়ে বেরিয়ে আসবেন লাল মামী। অবাক হয়ে বলবেন, 'রঞ্জু, কী হয়েছে রে, গান হয় কোথায়?'

তখন হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন নবু মামা। উৎসাহে নবু মামা টগবগ করছেন। আমি বললাম, 'নবু মামা, এখন একটা গান শুনি।'

নবু মামা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'না-না, এখন না। পরে শুনবি। ফার্স্টে কোনটা বাজাব বল তো?'

'কি করে বলব, কোনটা?'

সেদিন সন্ধ্যার আগেভাগেই ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি। ঘরদোর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। নবু মামা বিরক্ত মুখে বসে রইলেন। রাতের খাওয়াদাওয়া আজিজ খাঁর ওখানেই হল।

রাত যখন অনেক হয়েছে, লোকজন শুয়ে পড়েছে সবখানে, তখন আমরা উঠলাম। বৃষ্টি থামে নি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছেই। মাথায় ছাতা ধরে আধভেজা হয়ে বাড়িতে উঠলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। বাড়িতে জেগে নেই কেউ। শুধু নানাজানের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। দু' জনে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। দরজা খোলা হল অত্যন্ত সাবধানে। একটু ক্যাঁচ শব্দ হলেই দু' জনে চমকে উঠছি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে গ্রমোফোন বের করলেন নবু মামা। বহু কষ্ট করে চোঙ ফিট করা হল। দম দিতে গিয়ে বিপত্তি--ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ হয়। তবে ভরসার কথা--ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নবু মামা ফিসফিসেয়ে বললেন, 'কোন গানটা দিয়েছি কে জানে? একটা খুব বাজে গান আছে। এটা প্রথম এসে গেলে খারাপ হবে খুব।'

আমি বললাম, 'নবু মামা, দেরি করছ কেন?'

'দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমুক, নয়তো শুনবে না।'

বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই গান বেজে উঠল--

'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল?'

লাল মামী গান শুনে মুগ্ধ হবে কি, আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। কী অপূর্ব কিন্নরকণ্ঠে গান হচ্ছে! বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল।

নবু মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, ভাবী আসে না যে, ও রঞ্জু।'

আমি সে কথার জবাব দিলাম না। বাইরে তখন ঝড় উঠেছে। জানালার কপাটে শব্দ হচ্ছে খটখট। নবু মামা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি লাল মামী ডাকলেন, 'রঞ্জু, রঞ্জু।'

নবু মামা ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ করে থাক, কথা বলবি না।' আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা অন্য রেকর্ড চালিয়ে দিল--

'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন'

লাল মামী দরজায় ঘা দিলেন, 'ও রঞ্জু, কী ব্যাপার, গান হয় কোথায়?' নবু মামা উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভাবী, তোমার জন্য আনলাম। তোমার জন্য আনলাম।' নবু মামা লাল মামীর হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল। কী ফুর্তি তার! লাল মামী বললেন, 'কলের গান না? ছোটবেলায় দেখেছিলাম এক বার। চোঙ আছে? বাতি জ্বালাও না।'

বাতি জ্বালান হল। লাল মামীকে দেখব কী? নবু মামার দিকেই তাকিয়ে আছি। আনন্দে উত্তেজনায় নবু মামার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মামী বললেন, 'ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো গানটা আরেক বার দাও।'

সেই অপূর্ব গান আবার বেজে উঠল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টি।

সে-রাতের কথা আমার খুব মনে আছে।

একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনে মনে রাখবার মতো ঘটনা তো খুব সীমিত। কত মানুষ আছে, সমস্ত জীবন কেটে যায়, কোনো ঘটনাই মনে রাখবার মতো আবেগ তার ভেতর সৃষ্টি করে না। আমি নিজে কত কিছুই তো ভুলে বসে আছি। কিন্তু মনে আছে সে-রাতে গান শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এসেছিল। নবু মামা আর লাল মামী যেন দেখতে না পায় সে জন্যে আমি মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নবু মামা বললেন, 'ভাবী, আমার নাচতে মন চাইছে।'

'নাচ না।'

নবু মামা বললেন, 'রঞ্জু, তুই নাচবি আমার সঙ্গে?'

আমি সে-কথার জবাব দিলাম না। মামী বললেন, 'নবু, ঐ রেকর্ডটা আবার।'

'সারা রাত হবে আজকে, বুঝলে ভাবী।'

ক্লান্তি নেই নবু মামার। লাল মামীর উৎসাহও সীমাহীন। শুনতে শুনতে আমার

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

নবু মামা বললেন, 'গাধা! এত ফাইন গান, আর ঘুমায় কেমন দেখ।'

লাল মামী বললেন, 'আজ তাহলে থাক। ঘুমো তোরা।'

'না-না, থাকবে না। যতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি হবে ততক্ষণই গান হবে।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই কড়কড় করে বাজ পড়ল। ফুর্তিতে নবু মামা হো হো করে হেসে ফেললেন। মামী বললেন, 'রঞ্জুর ঘুম পাচ্ছে। এগুলি নিয়ে আমার ঘরে এসে পড় নবু, আমাকে ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো গানটা শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি কাগজে?'

'নিশ্চিয়ই পারব। নিশ্চয়ই।'

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছিল, উঠে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি বড়ো নানিজানের ঘরের লাগোয়া গাবগাছটি ভেঙে পড়ে গেছে। কেমন ন্যাড়া দেখাচ্ছে জায়গাটা। ভালোই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, বাতাস থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কে জানে গত বারের মতো এবারেও হয়তো বান ডাকবে। গত বার এ-রকম সময়ে বাড়ি থেকে নদীর শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি নবু মামা বলছেন, 'ভাবী, তুমিও গাও সঙ্গে সঙ্গে।'

'না না, আমি পারব না। তুই গা, মাটি মে পৌরণটা গা।'

নবু মামা হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন-

'মাটি মে পৌরণ, মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা
যব মাটি সে সব মিল যায়গা।'

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল মামী বললেন, 'দক্ষিণের জানালা বন্ধ কর নবু, ভিজে যাচ্ছি।'

নবু মামা বললেন, 'বাদশা ভাই কোথায়?'

'দু দিন ধরে দেখা নেই। কোথায় কে জানে। 'যদি ভাল না লাগে' গানটা দে। ঘুম আসছে যে আবার। ও নবু, তোর ঘুম পায় না?'

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। শুয়ে শুয়ে গান শুনতে কী ভালোই না লাগে! ক্রমে ক্রমে ঝড়ের মতো বাতাসের বেগ হল। বাড়ির লম্বা থামে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ উঠতে লাগল। দড়াম দড়াম শব্দ করে দরজা নড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়েছি হ্যারিকেন জ্বালাব বলে, ওমনি সফুরা খালা ডাকলেন, 'রঞ্জু, ও রঞ্জু।'

দরজা খুলে দেখি সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে সফুরা খালা বৃষ্টির ছাটে ভিজছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এদিকে গান হচ্ছিল নাকি রঞ্জু?'

'হ্যাঁ, নবু মামা কলের গান বাজাচ্ছিলেন। কলের গান এনেছেন নবু মামা।'

'নবু কোথায়?'

'লাল মামী আর নবু মামা গান বাজাচ্ছেন।'

সফুরা খালা আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'কই, গান শুনছি না তো?'

আমরা দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সফুরা খালা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'রঞ্জু, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।'

১০

সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাতে যে ভয় করবার মতো কিছু একটি লুকিয়ে ছিল, তা আমি বুঝতে পারি নি। সফুরা খালা শীতে কাঁপছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু শুধুমাত্র তাঁর কথা শুনেই ধারণা হল, কোথাও নিশ্চয়ই ভয় লুকিয়ে আছে।

সফুরা খালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত চলে গেলেন, যেন কোনো হিংস্র জন্তু তাঁকে তাড়া করছে। মাতালের মতো বেসামাল পদক্ষেপ। আমি এসে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠেছে ঝকঝকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব কিনা ভাবছি, তখন নবু মামা এসে ডাকলেন, 'আয়, মাছ মারতে যাই। নতুন পানিতে মেলা মাছ এসেছে।'

ছিপ, কানিজাল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নৌকা করে চললাম দু' জনে হলদাপোতা। কিন্তু নবু মামার মাছ মারার মন ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলতে লাগলেন। দুপুর পর্যন্ত আমরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। নবু মামার ভাবভঙ্গি আমার কাছে কেমন কেমন লাগল। তিনি যেন বিশেষ কোনো কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের কথা হলে কিশোরী মেয়েরা যেমন পালিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়, অনেকটা সে-রকম। নবু মামা বললেন, 'রঞ্জু, আমি আর পড়াশুনা করব না।'

'কেন?'

'ভালো লাগে না।'

'কী করবেন তবে?'

'ব্যবসা করব। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।'

'নানাজান মানবে না।'

'আমি কারো ধার ধারি নাকি?'

বলতে বলতে নবু মামা ঈষৎ হাসলেন। দুপুরে খাওয়ার জন্যে চিঁড়া আর নারিকেল আনা হয়েছিল, তাই খাওয়া হল। হলদাপোতা থেকে আমরা আরো উত্তরে সরে গেলাম।

আমার আর ভালো লাগছিল না, রোদে গা তেতে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে

যাই, কিন্তু নবু মামা বারবার বলছেন, 'একটা বড়ো মাছ ধরি আগে।'

সন্ধ্যার আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কাতল মাছ ধরা পড়ল। সুগঠিত দেহ, কালচে আঁশ বেলাশেষের রোদে ঝকমক করছে। নৌকার পাটাতনে মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। দু' জনেই মহা খুশি। নবু মামা খুব যত্নে বঁড়শি খুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, 'চলুন ফিরে চলি।'

'চল।'

ভাটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে। হঠাৎ করে নবু মামার ভাবান্তর হল। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'মাছটা ছেড়ে দিই রঞ্জু?'

'কেন মামা?'

'না, ছেড়ে দি।'

বলেই মাছটা জলে ফেললেন। আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা বললেন, 'একবার আমি একটা পাখি ধরেছিলাম। টিয়া পাখি। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমার খুব লাভ হয়েছিল।'

'কী লাভ?'

'হয়েছিল। আজকে মাছটা ছেড়ে দিলাম, দেখিস মাছটা দোওয়া করবে আমার জন্যে।'

নবু মামা পাটাতনে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি এসে দেখি হুলস্থূল কাণ্ড। লাল মামীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে সফুরা খালার। লাল মামী টেনে সফুরা খালার এক গোছা চুল তুলে ফেলেছে, গাল আঁচড়ে দিয়েছে। সফুরা খালা বিষম দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লাল মামী তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই।

বাদশা মামা আধময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, 'সবাই যদি এলাচির সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে বেচারি কী করবে? কেউ দেখতে পারে না।' ছোট নানিজান শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। এক বার ধমকে দিলেন, 'যা তুই, খামাখা ঘ্যানঘ্যান। ভাল্লাগে না।'

বাদশা মামা উঠোনে গিয়ে বসে রইলেন। বোকার মতো তাকাতে লাগলেন এদিক–সেদিক। নবু মামাকে দেখে বললেন, 'দেখলি নবু, সফুরা কী ঝগড়া করল? এলাচির সারা দিন খাওয়া নাই।'

রাতের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল। রান্নাবান্না হতে দেরি হয়েছে। সংসারযাত্রা কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমুতে এসে দেখি সফুরা খালা বসে আছেন আমাদের ঘরে। সফুরা খালা বললেন, 'তোমাদের জন্যে বাইরের বাংলাঘরে বিছানা হয়েছে। এ ঘরে আমি থাকব।' তাকিয়ে দেখি পরিপাটি করে ঘর সাজান। আমার আর নবু মামার ব্যাবহারিক জিনিসপত্র কিছুই নেই। নবু মামা

বললেন, 'তুই থাকবি কেন এখানে? তোর নিজের ঘর কী হল?'

'আমার ঘরে পানি পড়ে, বিছানা ভিজে যায়।'

নবু মামা কিছুক্ষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হনহন করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সফুরা খালা বললেন, 'রঞ্জু, তুমি নবুকে চোখে চোখে রাখবে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বাদশা মামার সঙ্গে দেখা। বাদশা মামা বললেন, 'রঞ্জু, এলাচি ভাত খেয়েছে কিনা জানিস?'

'জানি না।'

'মোহরের মা বলল, খেয়েছে। তুই একটু খোঁজ নিয়ে আয়।'

'আপনি নিজে যান না মামা।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজেই যাই।'

লাল মামী সেদিন না-খেয়ে ছিলেন। রাতেও খেলেন না, দুপুরেও ভাত নিয়ে গিয়ে মোহরের মা ফিরে এল। সফুরা খালা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত নানাজান এলেন। বিরক্ত ও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'এ সব কী বউ?'

লাল মামী কথা বললেন না। নানাজান বললেন, 'খাও খাও, ভাত খাও।'

'না, খাব না।'

সমস্ত দিন কেটে গেল। সফুরা খালা কাঁদতে লাগলেন। কী বিশ্রী অবস্থা! বাদশা মামা নৌকা করে চলে গিয়েছেন শ্রীপুর। লাল মামীর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একেবারে।

কানাবিবি বারবার বলে, 'বউয়ের কোনো খারাপ বাতাস লেগেছে, না হলে এমন হয়! মুকুন্দ ওঝাকে খবর দেও না এক বার।'

লাল মামীর মা খবর পেয়েই এসে পড়লেন। লাল মামী বলল 'না, আমি কিছুতেই খাব না। এ বাড়িতে কিছু খাব না আমি।' নানাজান বললেন, 'আচ্ছা, মেয়েকে না হয় নিয়েই যান। ক' দিন থেকে সুস্থ হয়ে আসুক।'

ধরাধরি করে লাল মামীকে নৌকায় তোলা হল। নৌকার পাটাতনে বাদশা মামা তাঁর সুটকেস নিয়ে আগে থেকেই বসে আছেন। লাল মামী বাদশা মামাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, 'ও গেলে আমি যাব না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি যাব না।'

বাদশা মামা চুপচাপ নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। যেন কিছুই হয় নি। তাঁর কাণ্ড দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

১১

নবু মামার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। মেয়ে তো আগেই ঠিক করা

ছিল, এবার কথাবার্তা এগুতে লাগল। নানাজান অনেক রকম মিষ্টি, হলুদ রংয়ের শাড়ি ও কানের দুল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন হেডমাষ্টার সাহেব, আজিজ খাঁ সাহেব। আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। কী মিষ্টি মেয়ে, শ্যামলা রং, বড়ো বড়ো চোখ। একনজর দেখলেই মন ভরে ওঠে। দেখে আমার বড়ো ভালো লাগল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি দিন ফেলে নানাজান উঠে এলেন।

বাড়িতে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। সবচেয়ে খুশি সফুরা খালা। হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গল্প। নবু মামার কিন্তু ভাবান্তর নেই। কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। মাছ ধরতে যান। কোথায়ও যাত্রাটাত্রার খবর পেলে যাত্রা শুনতে যান।

গ্রামের মাঠে ফুটবল নেমে গেছে। সারা বিকাল কাটান ফুটবল খেলে। সেন্টার ফরোয়ার্ডে তিনি দাঁড়ালে প্রতিপক্ষ তটস্থ হয়ে থাকে। শীল্ডের অনেক খেলা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের টীম খুব শক্ত। ফাইনালে উঠে যাবে সন্দেহ নেই। নবু মামা প্রাণপণে খেলেন। মরণপণ খেলা। বল নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তাঁর মাথার লম্বা চুল বাতাসে থরথরিয়ে কাঁপে। মাঠের বাইরে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে আমি তাই দেখি। রাতের বেলা গরম পানি করে আনি, নবু মামা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে নানা গল্প করেন। লাল মামী প্রসঙ্গে কোনো আলাপ হয় না। তিনি সেই যে গিয়েছেন আর ফেরার নাম নেই। বাদশা মামা প্রতি হাটবারে নৌকা নিয়ে চলে যান। আবার সেই দিনই ফিরে আসেন। লাল মামীর ঘরেই বাকি সময়টা কাটে তাঁর। আমি বুঝতে পারি কোথায়ও সুর কেটে গিয়েছে। ভালো লাগে না। কবে লিলির চিঠি আসবে, কবে আমি চলে যেতে পারব, তাই ভাবি। তখন আমি অনেক রকম স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে, অথচ বেরিয়েও আসতে পারছি না। বড়ো নানিজান অনেক সম্পত্তি নাকি আমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি।

তাছাড়া সে-সময়ে আমি প্রেমেও পড়েছিলাম। অচিনপুরের এই কাহিনীতে যে-প্রেমের উল্লেখ না করলেও চলে, কারণ তার কোনো ভূমিকা নেই এখানে। তবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হচ্ছিল আমার মধ্যে--এইটুকু বলা আবশ্যক।

নবু মামার স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট হল তখন। খুবই ভালো রেজাল্ট। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ বলে কী-একটা স্কলারশিপ পেলেন। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে নবু মামা রওনা হলেন। নানাজানের ইচ্ছে ছিল, নবু মামা যেন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নবু মামার ইচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ।

নবু মামার বিয়ের তারিখ ঠিকই থাকল। নবু মামা নিজেও এক দিন মেয়ে দেখে এলেন। সফুরা খালা যখন বললেন, 'মেয়ে পছন্দ হয়েছে?' নবু মামা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।

বারোই ভাদ্র তারিখে নবু মামা চলে গেলেন। আর তেরই ভাদ্র বাদশা মামা শ্রীপুর থেকে আধপাগল হয়ে ফিরে এলেন। আমি ভাসা ভাসা ভাবে শুনলাম, লাল মামী শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার নাম করে নবু মামার সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

কেউ যেন জানতে না পারে, সেই জন্যে বাদশা মামাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁর মাথার ঠিক নেই, কখন কাকে কী বলে বসেন। ছোট নানিজানের ফিটের ব্যারাম হয়ে গেল। সফুরা খালাকে দেখে কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ে না, শুধু তাঁর চোখে কালি পড়েছে। মুখ শুকিয়ে তাঁকে দেখায় বাচ্চা ছেলেদের মতো।

নানাজান সেই বৎসরেই হজ করতে গেলেন। যাওয়ার আগে সব সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত হল। বাদশা মামাকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন বটগাছ যেন চোখের সামনে শুকিয়ে উঠেছে। সবুজ পাতা ঝরে যাচ্ছে, কাণ্ড হয়েছে অশক্ত। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। শৈশবের যে অবুঝ ভালোবাসায় নানাজানের বাড়িটিকে আমি ঘিরে রেখেছিলাম, সেই ভালোবাসা করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি তো এখানের কেউ নই। এক দিন চুপচাপ চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না, রঞ্জু নামের আবেগপ্রবণ ছেলেটি হঠাৎ কোথায় চলে গেল।

এত বড়ো বাড়ি, অথচ এই ক' জন মাত্র মানুষ আমরা। রাতের বেলা গা ছমছম করে। মোহরের মা মাঝেমধ্যে চমকে ওঠে, 'ওটা কি গো, ও মা, ভূত নাকি?' গাছের পাতায় বাতাস লেগে সরসর শব্দ হয়।

এ বাড়ির সব কিছুই বদলে গেছে। লাল ফেজটুপি-পরা নানাজান সূর্য ওঠার আগেই উঠোনের চেয়ারে এসে আর বসেন না। 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' ঘুমঘুম চোখে অর্ধজাগ্রত কানে কত বার শুনেছি এই সুর। এখন সকালটা বড়ো চুপচাপ।

ভোরের আলোয় মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আমি চাই এ বাড়ির সবার মনের গ্লানি কেটে যাক। নবু মামা ফিরে এসে আগের মতো জোছনা দেখে উল্লাসে চিৎকার করুক : 'কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে করে!' সফুরা খালা ঠিক আগের মতো লাঠি হাতে 'পাখি উড়ে গেল' বলে এ সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট উড়িয়ে দিক। বাদশা মামা তার সাজ-পোশাক পরে হিরণ্য রাজার পার্ট করুক। কিন্তু তা আর হবে না, তা হবার নয়। আমি সংসারের মন্থর স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম। কারো সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই। দিন কেটে যেতে লাগল।

১২

টিনের কানেস্তারায় বাড়ি পড়েছে। উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। কৌতূহলী

হয়ে দাঁড়াতেই দেখি বাদশা মামা বিব্রত মুখে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে হাঁটছেন। তার আগে আরেক জনকে টিনে বাড়ি দিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে কী বলছে। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, মামা?'

'কিছু না, কিছু না।'

'ঢোল দিচ্ছে কে, আপনি নাকি?'

'হুঁ।'

'কিসের জন্যে?'

বাদশা মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'রহমত পাগলার জন্যে ঢোল দিচ্ছি। যদি কেউ পায়, তাহলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।'

'কেন, কী হয়েছে?'

বাদশা মামা এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু আমি ততক্ষণে তাঁর হাত চেপে ধরেছি। মামা অসহায়ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'বলেন কী ব্যাপার।'

'রঞ্জু, পাগলটাকে খেদিয়ে দেবার পর থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে, ফিরিয়ে আনলে যদি সব মিটে--'

মামা আমার হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

বাদশা মামা আরো অনেক রকম পাগলামি করতে লাগলেন। নানাজানের একটি আম-কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান ছিল, জলের দরে সেটি বেচে দিলেন। বিক্রির টাকা দিয়ে নাকি মসজিদ করবেন। ছোট নানিজান কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'এসব কী রে বাদশা?'

বাদশা মামা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন--সাদা পোশাক-পরা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বললেন, 'মসজিদ কর, সব কিছু ঠিক হবে।' ছোট নানিজান বললেন, 'বাদশা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস।' বাদশা মামা মাথা নিচু করে চলে গেলেন। মসজিদের জন্যে ইট পোড়ান হতে লাগল। ময়মনসিংহ থেকে রাজমিস্ত্রি এল। বিরাট এক মিলাদ মহফিলের মধ্যে মসজিদের কাজ শুরু হল।

নানাজানের দু'টি বিল ছিল। বিলের মাছ থেকে পয়সা আসত বিস্তর। সেই টাকায় সংসারখরচ গিয়েও বেশ মোটা অংশ জমত। বিল দু'টি একই সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল। কীভাবে হল, কেউ বলতে পারল না। নানিজান সারা দিন চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

রহিম শেখ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি মামলা রজু করল। সমস্তই মিথ্যা মামলা। বাদশা মামা নির্বিকার বসে আছেন মসজিদের সামনে। দেখছেন কী করে ইটের পর ইট বিছিয়ে ভিত তৈরি হচ্ছে। মামলার তদবিরের জন্য ছোট নানিজানকে নিয়ে আমিই যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। দীর্ঘ দিন মামলা চলল। দু'টিতে জিত হল

আমাদের, একটি রহিম শেখ পেল।

নানাজান হজ থেকে ফিরে এলেন এই সময়ে। সংসারের তখন ভরাডুবি ঘটেছে। রোজকার বাজারের টাকাতেও টানাটানি পড়তে শুরু করেছে। নানাজান কিছুই বললেন না। ছয় মাসেই তাঁর বয়স ছয় বছর বেড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিষ্প্রভ, একা একা হাঁটতে পারেন না। লাঠিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। চোখের সামনে সংসারকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তবু সকালবেলায় কোরান শরীফ ধরে বিলম্বিত সুরে পড়তে লাগলেন, 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।' অতএব তুমি আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে?

বৎসর যাবার আগেই সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হল। বাদশা মামার মসজিদ ততদিনে শেষ হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চমৎকার নকশি-কাটা গম্বুজ। ধবধবে সাদা দেয়ালে নীল হরফে লেখা কলমায়ে তৈয়ব। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমপারা হাতে সকালবেলাতেই মসজিদে ছবক নিতে আসে। দেখেশুনে বাদশা মামা মহাসুখী। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে মসজিদের সামনে পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কী সুন্দর টলটলে জল পুকুরে, পাথরে বাঁধান প্রশস্ত ঘাট।

বাদশা মামাকে দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগে। সাদা গোলটুপি পরে চোখে সুর্মা দিয়ে কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে নামাজ পড়তে যান। এক দিন আমাকে ডেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'রঞ্জু, জুমার রাত্রে তাহাযযতের নামাজ পড়ে শুয়েছি, অন্নি স্বপ্নে দেখি--তোর লাল মামী যেন নৌকায় করে ফিরে আসছে। আসবে ফিরে, দেখিস তুই।' বাদশা মামার চোখ আনন্দে চকচক করে।

লাল মামীর কথা ভাবতে চাই না আমি। তবু বড়ো মনে পড়ে। কে জানে কোথায় সংসার পেতেছে তারা। নাকি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়। কোনো দিন কি সত্যি ফিরে আসবে ধসে যাওয়া পরিবারটিকে শেষ বারের মতো দেখে যেতে?

নিজের কথাও আজকাল খুব ভাবি। আজন্ম যে-রহস্যময়তার ভেতর বড়ো হয়েছি তা সরে সরে যায়। মনে হয় কিছুই রহস্য নয়। চাঁদের আলো, ভোরের প্রথম সূর্য সমস্তই রহস্যের অতীত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। যে-নিয়মের ভেতর আমরা জন্মাই, বড়ো হই, দুঃখকষ্ট পাই। দুঃখ ও সুখ কী তা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করি। মোহরের মা যখন তার আজীবন সঞ্চিত পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও ব্যাটা রঞ্জু, যাই গো ব্যাটা। তোমার দুঃসময়ে একটা মানুষের বোঝা আর বাড়াইতাম না গো।' তখন আমার কোনো দুঃখবোধ হয় না। এ যেন ঘটতই। তাহলে দুঃখ কী? নতুন করে আবার সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে শুনে ছোট নানিজান যখন উন্মাদের মতো কাঁদেন, তখন বুঝি এই-ই দুঃখ। অথচ সফুরা

খালা যখন হাসিমুখে বলেন, 'গরিব মানুষ হওয়ার অনেক রকম মজা আছে রঞ্জু। তুমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, কেউ কিছু বলবে না।' তখন সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমি নানাজানের হাত ধরে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাই। হিম লেগে তাঁর কাশি হয়, খুকখুক করে কাশেন। আমি যদি বলি চলেন ঘরে যাই, নানাজান আঁৎকে ওঠেন, 'না-না, আরেকটু--আরেকটু বেড়াই।' পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে হাঁটেন। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি তাঁর সফেদ দাড়িতে চকচক করে।

১৩

লিলির যে-চিঠির জন্যে পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলাম, সে-চিঠি এসে গেছে। লিলি গোটা গোটা হরফে লিখেছে, 'আমি জানি, তুই রাগ করেছিস। কত দিন হল গিয়েছি, কিন্তু কখনো তোর কাছে চিঠি লিখি নি। কী করব বল? এমন খারাপ অবস্থা গেছে আমার। তোর দুলাভাইয়ের চাকরি নেই। বসতবাটিও পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে। একেবারে ভিক্ষা করবার মতো অবস্থা। কত দিন যে মাত্র এক বেলা খেয়েছি। তারপর আবার তোর দুলাভাইয়ের অসুখ হল। মরোমরো অবস্থা। এখন অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে সব। তুই অতি অবশ্যি এসে যা রঞ্জু।'

লিলির চিঠি পকেটে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সবাইকে ছেড়ে যেতে বড়ো মায়া লাগে। আশৈশব পরিচিত এ বাড়িঘর। বাদশা মামা, নানাজান, লাল মামী, নবু মামা এঁদের সবার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে যে-বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ছেড়ে কী করে যাই? আমি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সোনাখালির পুলের উপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। নৌকা নিয়ে চলে যাই হলদেপোতা। খুব জোছনা হলে সফুরা খালাকে নিয়ে পুকুরঘাটে বেড়াতে যাই। সফুরা খালা বলেন, 'তুমি কবে যাবে রঞ্জু?'

'যে-কোনো এক দিন যাব।'

'সেই যে- কোনো এক দিনটা কবে?'

'হবে এক দিন।'

একেক রাতে সফুরা খালা কাঁদেন। তাঁর গভীর বিষাদ বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। বুঝতে চাই না। যে-বন্ধন আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, কবে তা কাটবে, কবে চলে যাব--তাই ভাবি। নানাজানও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে?'

'না।'

'তোমার আর লিলির নামে যে-জমিজমা আছে, তার কী হবে?'

'যেমন আছে তেমন থাকবে।'

নানাজান কথা বললেন না। আমি জানি এই জমিটুকুই তাঁদের অবলম্বন।

সে রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল! সন্ধ্যা না নামতেই ঘন কুয়াশা চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাতের খাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে বাইরের ঘরে আসছি, হঠাৎ দেখি বাদশা মামা দারুণ উত্তেজিত হয়ে দ্রুত আসছেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

'রঞ্জু, দেখ দেখ।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটু দূরে, লাল মামী একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বাদশা মামা বলে চলেছেন, 'নৌকা করে সন্ধ্যার আগেই এরা দু' জন এসেছে। চুপচাপ বসে ছিল। আমি মসজিদে যাব বলে ওজু করতে গিয়েছি, এমন সময়....'

লাল মামী বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। (যে উঠোনে অনেক অনেক দিন আগে আমার মা তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।) কেউ কোনো কথা বলল না। নানাজান চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট নানিজান যেন কিছুই বুঝছেন না, এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগলেন। সফুরা খালা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিচে নেমে এলেন। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর গরম শালটা কোথায় সফুরা? এলাচির শীত করছে।'

নবু মামার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। সবাই চুপ করে রইল। একসময় দেখলাম লাল মামী কাঁদছেন।

আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিঁঝির ডাক শুনতে লাগলাম। অনেক রাতে বাদশা মামা আমাকে ডেকে নিলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'তোরা সবাই যদি দূরে দূরে থাকিস, তাহলে এলাচি কী মনে করবে বল? চল রঞ্জু।'

বাদশা মামা আমার হাত ধরলেন।

বহু দিন পর লাল মামীর ঘরে এসে ঢুকলাম। পালঙ্কে লাল মামী আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর কোলের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটি ঘুমিয়ে। আমি এসে বসতেই লাল মামী একটু সরে গেলেন। আমি বললাম, 'কেমন আছেন মামী?'

মামী মাথা নাড়লেন। বাদশা মামা বললেন, 'মোটেই ভালো না রঞ্জু। দেখ না, স্বাস্থ্য কী খারাপ হয়ে গেছে!' আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে পুরনো গ্রামোফোন খুঁজে বের করলেন।

আমি বললাম, 'আজ থাক, মামা।'

'না-না শুনি। আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।'

লাল মামী মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'না-না থাকুক। গান বাজাতে হবে না।'

তবু গান বেজে উঠল--

'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল।'

আমি চলে এলাম। এই অচিনপুরীতে থাকবার কাল আমার শেষ হয়েছে।
